রোশনাই

ভাদ্র
১৩৬৭

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শ্রুতাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুস্মিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরিক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optimcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

পূজোর দিনের খুশির শানাই

বাজার সঙ্গে সঙ্গেই "রোশনাই"

হেসে উঠবে নূতনরূপে !

তাতে থাকবে—

॥ কবিতা ॥ ছড়া ॥

৺দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার
নজরুল ইসলাম
কালিদাস রায়
নরেন্দ্র দেব
প্রেমেন্দ্র মিত্র
বন্দেআলী মিয়া
আশা দেবী
সুকোমল দাশগুপ্ত……ও অন্যান্য

॥ গল্প ॥ উপন্যাস ॥

৺সুনির্মল বসু
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
স্বপনবুড়ো
কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
ইন্দিরা দেবী
উপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক……ও অন্যান্য

এছাড়াও নাটক, জীবনকথা, ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে থাকবে কত বিচিত্র, নাচ-গান-ছন্দ, নিজে জানো জানাও সবে, দেশ-বিদেশের খেলার খবর, চিঠির জবাব ইত্যাদি বিচিত্র রসে পুষ্ট নূতন নূতন বিভাগ—যা ছোট বড়ো সকলেরই মনে রেখাপাত করবে।

শুধু প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনরাই নন—আগামী সংখ্যা থেকে নবাগত কিশোর সাহিত্যিকদের বলিষ্ঠ লেখনীও রোশনাই এর নব রূপায়ণে বিশেষ অংশ নেবে ॥

আগামী সংখ্যা "আশ্বিন" (পূজা সংখ্যা)

বের হবে ১লা আশ্বিন

রোশনাই

ঁ দেনায়

শ্রী রমেন দাস

(সবুজসাথী)

একমাত্র পরিবেশক

এশিয়া

পাবলিশিং কোং

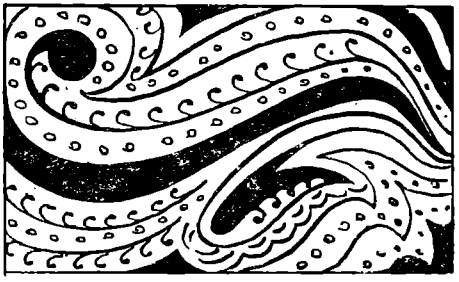

রোশনাই অনুরাগীদের কাছে

* প্রতি বাংলা মাসের প্রথম তারিখে প্রকাশ হয়। প্রতি সংখ্যা ৫০ নঃ পঃ, বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৬·০০। বাৎসরিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ডাক খরচ আমরাই বহন করি। বছরে দুটি সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশ পাবে। গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। টাকা-পয়সা, চিঠি-পত্র --"রোশনাই," এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা বারো—ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

* কোন সংখ্যা সময় মত না পেলে ঐ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে ডাকঘরের মতামত সহ আমাদের জানাতে হবে। আমাদের সংগে যোগাযোগের সময় গ্রাহক নম্বর নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ রাখতে হবে।

* লেখা পাঠাতে হলে পরিষ্কার করে এক পৃষ্ঠায় (নকল রেখে) পাঠাবেন। প্রয়োজনীয় ডাক টিকেট না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সংগে ঠিকানা ও নাম অবশ্যই উল্লেখ রাখতে হবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা, তাদের তোলা বা আঁকা ছবি বয়সের তারতম্য অনুযায়ী বিচার করা হয়।

* রোশনাই-এর বর্ষ ভাদ্র থেকে সুরু। বছরের যে কোন মাসে গ্রাহক হওয়া যায়। কোন সময় হইতে গ্রাহক হইতে চান মনি অর্ডার কুপন বা চিঠিতে উল্লেখ রাখবেন। প্রয়োজনবোধে অভিভাবকের নামও জানিয়ে রাখা ভাল।

* ১০ কপির কম সংখ্যায় কোন এজেন্সী দেওয়া হয় না। আর আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব ২৫ কপির কম সংখ্যায় দেওয়া হয় না। এজেন্সীর জন্য ৫০০ অগ্রীম দেয়।

যাঁদের লেখা আছে

হে নূতন	৺সুনির্মল বসু	১
একটি প্রতিবাদের গল্প	মলয়শংকর দাশগুপ্ত	২
আমরা কারা রাক্ষসের মামা ?		৪
তুফান	নরেন্দ্র দেব	৫
সামান্য আংটি	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৬
মেঘ-রৌদ্রের খেলা	স্বপনবুড়ো	১১
দীর্ঘজীবি কারা ?		১৮
পনরই আগস্ট	রবীন্দ্রনাথ সরকার	১৯
শরতের কবিতা	গোবিন্দপ্রসাদ বসু	২৪
এমন হয় নাকি	ধীরেন্দ্রলাল ধর	২৫
আমরা কি সব বাতাস খেকো ?		৩০
হারিয়ে গেছি	বন্দে আলী মিয়া	৩১
ট্রেন আছে ড্রাইভার নেই	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৩২
যে যা নয় সে তাই হ'লে	হরেন ঘটক	৩৬
দেশ বিদেশের খেলার খবর	রবি চক্রবর্তী	৩৮
ধাঁ ধাঁ		৪১
একটি শিকারীর কাহিনী	চিত্তরঞ্জন মাইতি	৪২
নিজে জানো জানাও সবে	শ্রীসাংবাদিক	৪৪
নাচ গান ছন্দ		৪৭
তোমাদের কাছে	সম্পাদকীয়	৪৯

॥ প্রচ্ছদ॥রমেন আচার্য ॥

॥ খেলোয়াড় ॥

আলোক চিত্র ঃ অনিল ঘোষাল

খেলার মাঠে গিয়ে সবাই
কেবল করে ভীড়
পয়সা দিয়েও টিকিট পাওয়া ভার !
আমি কি ভাই কম্‌তি কিছু ?
সবাই দেখে যাও,
আমিও এক মস্ত খেলোয়াড় !

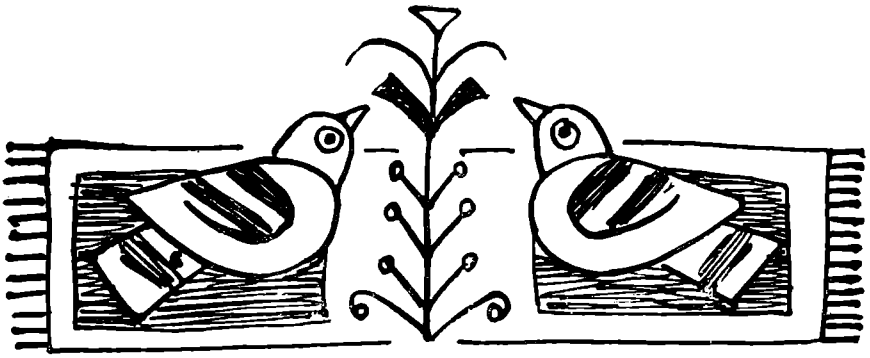

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩৬৭

রোশনাই

৫০ নয়া পয়সা

॥ হে নূতন ॥

—সুনির্মল বসু

চির নূতনের গান যাঁরা গায় ভাইরে—
আমি চিরদিন তাঁদের সঙ্গ চাইরে।
চাইরে তাঁদের মনের কথাটি জানতে—
তাঁদের ছন্দে ছন্দ মিলায়ে আন্‌তে
প্রাণের বন্যা দেশ দেশান্তে নিত্য—
ভরিয়ে তুলতে হতাশ-আতুর চিত্ত!
হে নূতন, তাই তুমি দিয়ে চিরসঙ্গ
ছন্দ ও সুরে ভরে তোল দেশ-বঙ্গ।

একটি প্রতিবাদের গল্প

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

ছোট্ট ছেলে। সবে মাত্র তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। এতোদিন স্কুলের পণ্ডিত মশাইর কাছে পড়তে হতো। এবার থেকে ইংরেজী পড়ার শুরু, সেজন্য মাস্টার মশাইদের কাছে পড়তে হবে।

নতুন ক্লাসের নতুন পড়া। নতুন মাস্টার মশাই ক্লাসে এসেছেন। তিনি ইংরেজী পড়াবেন। কতো উৎসাহ ছেলেদের। নতুন মাস্টারমশাই নতুন বই খুলে নতুন পড়া শুরু করলেন। অন্যান্য ছেলেদের মতো সেই ছোট্ট ছেলেটিও ক্লাসে এসেছে মাস্টার মশাই পড়িয়ে চলেছেন। হঠাৎ কি হলো, মাস্টার মশাই একটা ইংরেজী শব্দের একটু ভিন্ন ধরণের উচ্চারণ করে বসলেন; যে উচ্চারণটা ঠিক ঠিক ও শব্দটির নয় কথাটা হচ্ছে 'পুডিং,' কিন্তু, মাস্টার মশাই বলে চলেছেন 'পাডিং'! সেই ছোট্ট ছেলেটি কিন্তু এই শব্দটির ঠিক ঠিক উচ্চারণ জানতো। বাড়িতে বাড়ির মাস্টার মশাইদের কাছে তার আগে থেকে এসব পড়া তৈরী হয়েই ছিল। তাই শুদ্ধ উচ্চারণটি ঠিক ঠিক জানা থাকতে সেই ছোট্ট ছেলেটি আপত্তি জানালো, 'না মাস্টার মশাই, ও কথাটা 'পাডিং' হবে না, ওটা হচ্ছে 'পুডিং'।

'কী কথা, মাস্টার মশাই শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ জানেন না, তা অবার বলছে এ ক্লাসেরই একটি ছোট্ট ছেলে! কম কথা তো নয়': ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরা তো সে ছেলেটির কথা শুনে একেবারে চমকে উঠলো। 'তাই তো, সকলে ভাবলো না জানি কী দুর্দশা আছে ছেলেটির কপালে! ইংরেজী মাস্টার মশাইর কথায় ভুল ধরা বাপের বাপ, কি বিচ্ছু ছেলে রে বাবা

মাস্টার মশাই গম্ভীর হয়ে কথাটা শুনলেন গম্ভীর স্বরেই ধমক দিলেন: তোমার থেকে আমি ভালো করেই জানি; এর উচ্চারণ 'পুডিং' নয় 'পাডিং' ছোট্ট ছেলেটিও বলে ওঠে: না মাস্টার মশাই পাডিং হবে কি করে, পুডিংই তো হয় মাস্টার মশাই আবার রেগে যান। কী কথা এইটুকুন পুঁচকে ছেলে, সে ধরছে আমার ভুল তিনি বলে ওঠেন: না 'পুডিং' নয়, বলো 'পাডিং'।

ছেলেরা সকলেই ভয়ে অস্থির। একেবারে চুপ চাপ। হতবাক হয়ে ছেলেরা সেই

ছোট্ট ছেলে আর মাস্টার মশাইর দিকে তাকাচ্ছে। ছোট্ট ছেলেটি আবার বলে উঠল কখ্খনো নয়, এ কথাটা 'পাডিং' মোটেও নয়, হবে 'পৃডিং'—'পাডিং' ভুল উচ্চারণ।

কথাটা কিন্তু 'পুডিং' ই। তোমাদের সকলেরই জানা আছে যে 'পুডিং' একটা খুব নাম করা খাবারের নাম। ছেলেটির আবার এই নামের খাবারটির সাথে বিশেষ পরিচয় থাকাতে সে জোর গলাতেই আবার বলে উঠেঃ না সার্, 'পুডিং' হবে। মাস্টার মশাইও নাছোড়-বান্দা। ছেলেটিকে দিয়ে তিনি 'পাডিং' বলাবেনই। তবে ছাড়বেন। ছেলেটিও কিছুতেই তা বলবে না। বলবে না তো বলবেই না ঃ কেন সে ভুল উচ্চারণ করতে যাবে? বলতে হলে সে 'পুডিং' ই বলবে। সেটাই তো খাঁটি উচ্চারণ!

মাস্টার মশাই অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতিবার উত্তর আসে 'পুডিং'। মাস্টার মশাই আরো রেগে যান ; শেষকালে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন তিনি। চিৎকার করে সেই ছোট্ট ছেলেটিকে বলেনঃ সে যদি তাঁর মতন করে উচ্চারণ না করে তাহলে তাকে 'কনফাইন' করবেন, অবাধ্যতার জন্য স্কুল ছুটির পরেও তাকে শাস্তিস্বরূপ আরো কয়েক ঘণ্টা সেখানে আটকিয়ে রাখবেন। ছোট্ট ছেলেটির সেই এক কথা ঃ 'পুডিং'। হোক শাস্তি তবু 'পাডিং' সে বলতে পারবে না।

মাস্টার মশাই রেগে একাকার। ছেলেটিরও এক কথা। পুডিং পুডিং পুডিং। যাহোক ছুটির ঘণ্টা পড়তেই যে যার খাতাপত্র বগলদাবা করে বাড়ি ফিরে গেলো। কিন্তু ছেলেটির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে···সে তো যেতে পারবে না। যতক্ষণ না 'পাডিং' বলে!

প্রতি দিনের মতো সেই ছেলেটির বাড়ি থেকে লোক এলো তাকে সাথে করে বাড়ি নিয়ে যেতে। কিন্তু সে তো এখন যাবার ছাড়পত্র পাবে না। ইংরেজী মাস্টার মশাইর শাস্তিটা তো তাকে ভোগ করতে হবে। বাড়ির লোককে বাধ্য হয়েই অপেক্ষা করতে হয়·····কীরে বাবা লেখাপড়ার এ দেখছি হাজার রকম ঝামেলা!

শাস্তির আদেশ দিয়ে সেই মাস্টার মশাই নিজের কাজকর্ম সারতে কোথায় যেন একটু বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে ভাবলেন এবারে বোধ হয় কথা শুনবে ছেলেটা, ভয় পেয়ে হয়তো নরম হবে। তাই ফিরে এসেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'কি রে এবারে 'পাডিং' বলবি তো!' তবুও উত্তর আসে 'পুডিং'। সেই ছোট্ট ছেলেটির ওই কথা যেই না বলা অমনি মাস্টার মশাই হাতের বেতটা দিয়ে সপাসপ বসিয়ে দিলেন খানকতক। মাস্টার মশাইও সমানে বলতে থাকেনঃ এবারে বল—'পাডিং।'

ঃ না 'পুডিং' ছেলেটি সদর্পে উত্তর দেয়। আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ উত্তর।

মাস্টার মশাই ছোট্ট ছেলেটিকে দিয়ে আর তাঁর মনের মতন উচ্চারণ করাতে পারলেন না। ছেলেটি 'পাডিং বললে নিশ্চয়ই অনেক আগে ছাড়া পেয়ে যেতো, কিন্তু তবু সে কিছুতেই ভুল উচ্চারণ করতে রাজি হলো না। কিন্তু কেন? কেননা সে ঠিকই জানতো সে কথাটার প্রকৃত উচ্চারণ—মাস্টার মশাই হলেও ভুলটাকে সে মেনে নিতে যাবে কেন। সেদিনকার ঘটনা ওই পর্যন্তই। কিন্তু দেখতে পাচ্ছো যে সামান্য একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে সৎ প্রতিবাদের একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে সেই ছোট্ট ছেলেটি। একেবারে অনমনীয় চরিত্রের পরিচয় দিলো ছেলেটি সেদিন। জীবনের প্রথম লগ্নেই তার মধ্যে এই বিশেষ দিকটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। স্কুল ছাত্র ছোট্ট ছেলেটি, যাঁর কথা বললাম তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর আঁকা অনেক ছবি তোমরা দেখেছো, যাঁর লেখা শকুন্তলা, বুড়ো আংলা, রাজকাহিনী, নালক প্রভৃতি অনেক অনেক লেখা পড়েছো। সেই সেদিনের ছোট্ট ছেলেটিই হলেন আমাদের অবনদাদু।

॥ আমারা কারা, রাক্ষসের মামা ॥

রোজ আমরা যা খাই না কেন, তুমি আমি সত্তর বছর বেঁচে থাকলে গড়পড়তায় যা খাই, তা শুনলে তোমরাও ভাববে, আমরা রাক্ষস, না রাক্ষসের মামা? বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন একটি মানুষ সত্তর বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকলে রুটি বা ভাত খায় ছয় হাজার দুইশত পঞ্চান্ন মণ; বারহাজার ডিম বা ঐ পরিমাণের ডিম জাতীয় খাবার; সাতষট্টি মণ মাংস বা ঐ জাতীয় খাবার; একশ পঞ্চাশ মণ মাছ; আটশ মণ আলু আর দুধ-জল-ডাব ইত্যাদি পানীয় দ্রব্য ছয় হাজার দুশত মণ! নিজের পেটের দিকে তাকিয়ে, ঐ হিসেব তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কি? কিন্তু অবিশ্বাসই বা করবে কি করে ওটা যে বিজ্ঞানীদের হিসেব।

॥ তুফান ॥

নরেন্দ্র দেব

তুফান আনো, তুফান আনো,
পাতাল চিরে কৃপাণ হানো ;
গাঁয়ের মজা নিথর গাঙে
অচল তরীর নোঙর তোলো,
ভাঙুক যদি জাঙাল ভাঙে।
শিকল ছেঁড়ো, বাঁধন খোলো—
শিরদাঁড়াটা দাঁড়াক রুখে
ফুলিয়ে পেশী চওড়া বুকে
হেঁইয়ো হেঁইয়ো হাকাও নাও
এগিয়ে চলো কিনার ছেড়ে
দাবিয়ে ঘোরো দরিয়া ফেঁড়ে,
হালের পানি নাই বা পাও।

হাজার দাঁড়ে হাজার টানে
তর তরিয়ে হাওয়ার পানে
জোয়ান তরী ছুটুক বেগে—
উঠুক ভাটিয়ালীর গানে
সারি জারির ছন্দে প্রাণে
সুরের শিখা উঠুক জেগে !
ঝাঁপিয়ে পড়ো ঝড়ের রাতে
লাফিয়ে পড়ো ঝড়ের রাতে
'বদর বদর' আওয়াজ ধরি।
তুফান যদি প্রলয় আনে
বৈইঠা ধরো শক্ত টানে
আশার পালে ভাসাও তরী !

সামান্য আংটি

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সামান্য একটা আংটি মানুষের জীবনে কত কি কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে তা জানো কি? একটি মজার গল্প বলছি শোন ঃ—

অনেকদিন আগের কথা। প্রায় দু'শ বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। স্কটল্যাণ্ডের এক গ্রামে।

এক জমিদার বাড়িতে ছোট একটি ছোক্‌রা চাকর ছিল। তের চোদ্দ বছরের ছেলে, খুব বিশ্বাসী আর চটপটে বলে মনিবরা খুব ভালবাসতেন। একদিন সেই মনিবের এক বন্ধুর বোনের বিয়ে—নিজে যেতে পারবেন না, কিছু উপহার পাঠাবেন এই স্থির করেছিলেন। পাথর বসানো দামি আংটি। বন্ধুর বাড়ি পাশের এক গ্রামে—মধ্যে শুধু একটা নদী। তাও সাঁকো আছে, যেতে আসতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশী লাগে না। ঠিক হ'ল, ঐ ছোকরা চাকর—জ্যাক্ তার নাম, সেই গিয়ে বিয়ের দিন সকালে উপহারটা পৌঁছে দিয়ে আসবে।

নির্দিষ্ট দিনে জ্যাক্‌কে ডেকে মনিব আংটিটা দিলেন, 'খুব সাবধানে নিয়ে যেও—দামী আংটি। গিয়ে সোজা আমার বন্ধুর হাতে দেবে, আশা করি দুপুরের মধ্যেই দিয়ে আসতে পারবে।'

সামান্য পথ—তাছাড়া এই সময়টা অত্যন্ত ফাইফরমাশ খাটা থেকে ত অব্যাহতি মিলবে—জ্যাক্ বেশ খুশী হয়েই চল্‌ল, আপন মনে শীষ দিতে দিতে। হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশঃ নদীর ধারে এসে পড়ল—সাঁকো পার হলেই পাশের গ্রাম শুরু—খুব জোরে—জোরে পা হাঁকালে জ্যাক্। কিন্তু ঠিক সাঁকোর নিচটায় এসে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়াল। আচ্ছা, কেউ ত কোথাও নেই, একবার আংটিটা দেখে নিলে কেমন হয়? কদিন ধরেই ত শুনছি দামী আংটি—খুব ভাল পাথর বসানো, দেখব নাকি একবার খুলে? ক্ষতি কি? ওখানে গিয়ে পড়লে ত আর দেখতে পারবো না। না, একবার সে দেখবেই—যা থাকে কপালে।

ভেলভেট মোড়া বাক্স, তার ওপর একটি পাতলা কাগজ মোড়ানো। আস্তে আস্তে

কাগজটা খুলে, বাক্সটাও খুলে ফেললে। কিন্তু আনাড়ী ত, কোনটা বাক্সর সোজা দিক ঠিক বুঝতে না পেরে উলটো করেই খুললে—মানে ডালাটা রইল নিচের দিকে, ফলে টুপ করে আংটিটা গেল পড়ে।

আর পড়ল যেখানে—যেখানে জ্যাক্ দাঁড়িয়েছিল—সেটা নদীর পাড়। তখনই ভাঁটা সুরু হয়েছে নদীতে, এতক্ষণ জোয়ারে জল ছিল সেখানে, সবে সরে গেছে, নরম পাঁক বা কাদা।—তারই মধ্যে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে যে আংটিটা কোথায় ডুবে গেল—আর দেখা গেল না। খোঁজ খোঁজ। মুখ শুকিয়ে উঠল জ্যাকের। অমন আংটিটায় কাদা লেগে গেল, ভাল করে যদি পরিস্কার করতে না পারে তাঁরা কি মনে করবেন।

কিন্তু সেত পরের কথা। এখন আংটিটা গেল কোথায়? একি, এইত পড়ল—এইত এইখানে। আরও মুখ শুকিয়ে উঠল জ্যাকের, কপালে ঘাম দেখা দিল—এতক্ষণ হেঁট হয়ে খুঁজছিল, এবার সেই পাঁকের ওপরই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে পাগলের মত কাদার মধ্যে খুঁজতে শুরু করলে। তন্ন তন্ন করে খুঁজলে—নদীর জল থেকে শুরু করে সেই সাঁকোর ধার পর্যন্ত, ওধারে বড় ওক গাছের তলা—কোথাও নেই। জানে এতদূর আসেনি, আসতে পারে না, তবু খুঁজলে। জলে পড়া সম্ভব নয়, তবু একহাটু জলে গিয়ে পাগলের মত হাতড়াতে লাগল। জামার হাতা ভিজল, পাজামা জলে-কাদায় মাখামাখি, টুপিটা কোথায় পাঁকে পড়ে গেছে—ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। সত্যিই পাবেনা নাকি? কী সর্বনাশ!

সত্যিই কিন্তু পেল না। বেলা বেড়ে যাচ্ছে, এতক্ষণে ওর গিয়ে পৌছানো উচিত ছিল। আর একটু পরেই হয়ত খোঁজা খুঁজি শুরু হবে। হয়ত আর খানিকটা দেখে ওঁরা বন্ধুর বাড়ি লোক পাঠাবেন, তখন জানা যাবে যে জ্যাক্ পৌছায়নি। তারপর হয়ত ওঁরা পুলিসে খবর দেবেন।

ভয়ে লজ্জায় জ্যাক কেঁদে ফেল্‌লে। পাগলের মত নিজের কপাল নিজেই ঠুকতে লাগল গাছের গুড়িতে।

কী হবে, কি করবে এখন?

ফিরে গিয়ে সব কথা বলবে?

তারপর মার এবং অপমান সইবে?

শুধু মার হলেও লজ্জা ছিল না—কিন্তু ওঁরা যে ওকে অবিশ্বাস করবেন, ওঁরা হয়ত মনে করবেন যে সে নিজেই চুরি করে মিছে বলছে সেইটাই যে মর্মান্তিক! না তার চেয়ে

মরে যাওয়া ভাল। চোর অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিলে এমনিইত কোথাও চাকরি পাবে না। সেই মরতেই হবে, না খেয়ে।

আর এত দিনের এত বিশ্বাসের পরে—এই? ছি!

অনেক বেশী বয়সের অত চাকর থাকতেও তাঁরা বিশ্বাস করে ওকেই দামী জিনিসটা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন—সে তার মর্যাদা রাখতে পারল না? এমুখ সে দেখাবে কি করে? অনেক ভেবে ভেবে সে স্থির করলে যে এমুখ আর সে ওদের সত্যিই দেখাতে পারবে না। তখন আরও খানিকটা বেলা বেড়ে গেছে। এতক্ষণে ওরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই। আর মোটে সময় নেই, পালাতে হলে এখনই।

জ্যাক্ উঠে পড়ে উলটো দিক ধরে পাগলের মত দৌড়তে লাগল। কোথায় যাচ্ছে ত কিছু জানে না, শুধু এটুকু জানে যে ওখান থেকে যতটা দূরে হয় তাকে পালাতে হবে, দৌড় দৌড়—ঘামে সমস্ত জামা ভিজে উঠেছে, পা তার চলছে না, পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত চোখ মুখ, সমস্ত জামা কাপড় ভিজে আর কাদায় মাখা মাখি, অমনি ভাবে দৌড়চ্ছে, সবাই ভাবল পাগল। কেউ হাসাহাসি করলে, করুণায় কারুর চোখ ছল ছল করতে লাগল, কোনও গ্রামে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল পাগল ভেবে—কোনদিকে ওর দৃষ্টি নেই, দৌড়চ্ছে ত দৌড়চ্ছেই। হাপরের মত নিঃশ্বাস পড়ছে, কপালের নোনা ঘাম গড়িয়ে জ্বালা করছে—দৃষ্টি হয়ে পড়েছে ঝাপসা। তবু দৌড়তে যে ওকে হবেই।

এমনি করে একেবারে যখন রাত হ'ল, একটা গাছ তলায় এলিয়ে শুয়ে পড়ল। সেইখানেই ঘুমিয়ে রাত কাটাল। পরের দিন সকালে আর উঠতে পারে না। হাত পা ভারি পাথর হয়ে উঠেছে। কিন্তু উঠতে ত হবেই। পকেটে একটা পয়সাও নেই, ক্ষুধাতে পেট কামড়াচ্ছে! সেই কাল সকালে যা সামান্য কিছু খেয়েছে—প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে তারপর। অতি কষ্টে উঠে আবার চলতে শুরু করলে। প্রথমেই যে গ্রাম পড়ল সেখানে একটা চাষীর বাড়ি গিয়ে জানাল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দেবে কিছু?

ঐ বেশভূষা দেখে প্রথমটা তাদেরও সন্দেহ হয়েছিল। চোর নয়ত? জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় যাবে? কোথা থেকে আসছ?' জ্যাক্ বলল, 'জাহাজে চাকরি করব। বন্দরের দিকে চলেছি। আমার সব পয়সা হারিয়ে গেছে ভাই।'

'জামা কাপড়ের এ হাল কেন তোমার?'

'পা পিছলে নদীর ধারে পড়ে গেছলুম যে।'

তাদের দয়া হল। খেতে দিল চা আর রুটি আর একটু পনির। খেয়ে যেন বাঁচল। তারপর বন্দরের সোজা পথটা জেনে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলে। বন্দরের কথাটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেছল—এখন ভাবল সে'মন্দ কি! এদেশ ছেড়ে পালাতে গেলে জাহাজে চাকরি নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

ওর সৌভাগ্য ক্রমে জাহাজ ঘাটায় যখন পৌঁছল তখন একটা জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে।

জ্যাক্ গিয়ে কাপ্তেনের হাতে পায়ে ধরল, 'আমাকে আপনার জাহাজে নিন, শুধু পেট ভাতায় কাজ করব। যা বলবেন সব করব। এক পয়সা মাইনে চাইনে আমার।' কাপ্তেনের লোকের দরকারও ছিল, তিনি খুশি হয়ে ওকে কাজ দিলেন।

দীর্ঘ দিন পরে জাহাজ যখন অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছল তখন জ্যাক্ নেমে গেল। কাপ্তেন ওর কাজে খুশি হয়েছিলেন—তিনি ওকে কটা টাকা দিলেন বকশিশ আর এক পুরানো বন্ধুর কাছে চিঠি লিখে দিলেন—ওর চাকরির জন্য।

জ্যাকের ভাগ্য ফিরল এবার।

চাকরি থেকে টাকা জমিয়ে ব্যবসা, সেখান থেকে টাকা জমিয়ে চাষবাস, ক্ষেতখামার। দেখতে দেখতে বছর কুড়ি বাইশের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা জমিয়ে ফেলল সে। এক পশমের ব্যবসাতেই তার কত লক্ষ টাকা বছরে আয়।

আরও কয়েক বছর পরে, বুড়ো বয়সে ইচ্ছা হ'ল দেশে ফিরবেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন ওদের দেশে যে জমিদার বাড়ি তিনি কাজ করতেন তাদের অবস্থা এখন খুব পড়ে

গেছে—সেই জমিদার বাড়ি বিক্রী হবে। জমি জমা যায় বাড়িটা সুদ্ধ। লোক পাঠিয়ে সেটা কিনে নিলেন তিনি। তারপর কাজ কারবার গুটিয়ে একদিন দেশের ছেলে দেশে ফিরে এলেন। যে বাড়িতে চাকরের কাজ করতেন, সেই বাড়িতেই অসংখ্য দাসী চাকর রেখে মনিব হয়ে বসলেন।

দিন কাটে।

সুখ-সৌভাগ্য ভরা সংসার। অভাব নেই কিছুরই। তবু আংটির কথাটা ভুলতে পারলেন না। একি ভোলবার? সেদিন যেটা শোচনীয় ঘটনা বলে মনে হয়েছিল তাহতেই ত সৌভাগ্যের সূত্রপাত। আংটিটা সেদিন না হারালে হয়ত কোথাও যাওয়াই হ'ত না—কোন দিনই উন্নতি হ'ত না। আজও হয়ত কোথাও চাকরি করতে হ'ত সামান্য মাইনের।

একদিন নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে সেই কথাটাই বলছিলেন এক বন্ধুকে। আরব্য উপন্যাসের মত আজব কাহিনী বর্ণনা করে নদীর ধারে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে কাদার মধ্যে হাতের লাঠিটা পুরে দিয়ে বললেন, 'এই, ঠিক এই জায়গাটাতেই আংটিটা সেদিন পড়ে গিয়েছিল। আমার আজও মনে আছে স্পষ্ট।'

বন্ধু অলসভাবে বললেন, 'অ, তাই নাকি!'

কিন্তু জ্যাক্ এমন চমকে উঠলেন কেন?

লাঠির ডগায় ও কী একটা আটকে আছে? কী ওটা? আংটি! একটা আংটি। ঠিক ত! দেখি দেখি।

জ্যাক্ তাড়াতাড়ি তুলে দেখলেন—সেই আংটিটাই, যেমন পাথর বসানো ছিল তেমনিই।

যেন ওকে সৌভাগ্যের পথে ঠেলে পাঠাতেই হারিয়েছিল, আজ প্রয়োজন মিটে গেছে বলে ফিরে এল। নইলে, ঐখানটা সেদিন ত অন্তত পাঁচশ বার হাতড়েছিলেন।.....

তোমরা ভাবছ উদ্ভট গল্প।

কিন্তু তা নয়—সত্যিই ঘটনা ঘটেছিল। জায়গাটাও বলে দিচ্ছি—স্কট্‌ল্যাণ্ড।

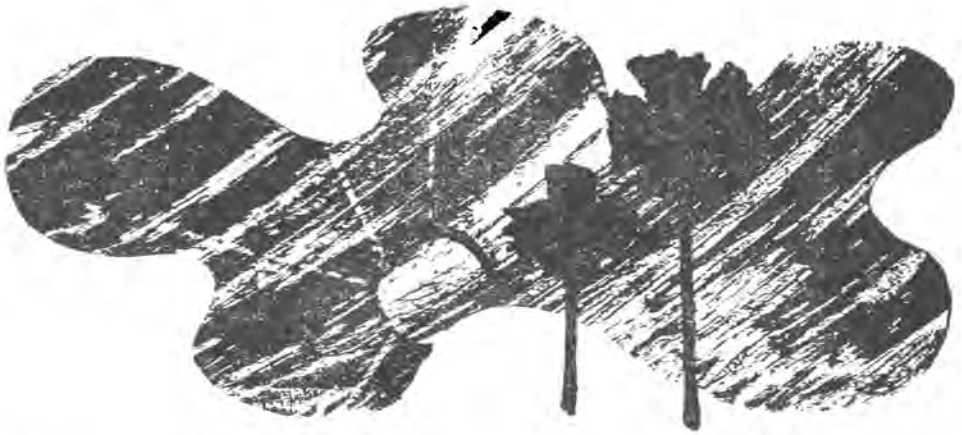

মেঘ-রৌদ্রের খেলা * স্বপনবুড়ো

[এক]

সারারাত ধরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

এতটুকু বিরাম নেই।

গ্রামের একান্তে প্রকাণ্ড চক মেলানো অট্টালিকা। সেই বিরাট ভবনের মালিক জমিদার অনন্তরাম। অনন্তরাম সারারাত ভালো করে ঘুমুতে পারেন নি। মনে একটা দুশ্চিন্তা থাকলে কি সুনিদ্রা হয়? অনন্তরামের একমাত্র নাতি প্রসূনরামের ছেলে হবে। তাই অনন্তরাম একমাস ধরে উৎকণ্ঠিত। পুত্র রাধেশরামের অকাল মৃত্যুর পর একমাত্র নাতি প্রসূনরামকে তিনিই মানুষ করে তুলেছেন। সেই নাতি এখন কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে।

সাধ-আহ্লাদ করে নাতির অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছেন, তিনি বংশধর দেখে দু চোখ বুজতে চান। তাই তাঁর এত উৎকণ্ঠা!

নাত্‌বৌয়ের জন্যে দাই রেখে দিয়েছেন। গ্রামের ডাক্তার এসে দুবেলা দেখে যাচ্ছেন। সেই ডাক্তারই গত সন্ধ্যের সময় বলে গিয়েছেন রাত্রেই প্রসব হতে পারে।

চিন্তায়-ভাবনায় বৃদ্ধ জমিদার অনন্তরাম সারা রাত ভালো করে ঘুমুতে পারেন নি!

তাঁর এ রকমটি কখনো হয় না। খাসচাকর হারানিধি ঠিক নিয়মমত রাত্রের আহারের পর অম্বরী তামাক সাজিয়ে নলটা হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি ধীরে ধীরে টান দিয়েছেন সেই নলে। সুবাসিত তামাকের গন্ধে সারা ঘরটা আমেজে ভরে গিয়েছে, কিন্তু জমিদার অনন্তরামের মনে এতটুকু স্বোয়াস্তি ছিল না। তিনি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। জন্ম-লগ্নটা ঠিক মতো লিখে রাখতে হবে। বাচস্পতি মশাইকে দিয়ে একটা ঠিকুজী তৈরী করে নিতে হবে নবজাত শিশুর। তিনি বেঁচে থাক্‌তেই জেনে যেতে চান—তাঁর একমাত্র পুতির ভাগ্যে বিধাতা পুরুষ কি লিখে দিয়েছেন।

তাই সুনিদ্রা হয় নি অনন্তরামের।

ঝিম্ ঝিম্ শব্দে সারারাত বর্ষা চলেছে। তারই মধুর আমেজে জমিদার অনন্তরামের দুটি চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, কিন্তু ঘড়ির শব্দ শুন্‌লেই সে ঘুম আচম্‌কা ভেঙে গিয়েছে!

কখনো বৃষ্টির শব্দ শুনে ঘুমের ঘোরে মনে হয়েছে কেউ যেন বৈঠকখানা ঘরে একটানা সেতারের আলাপ করে চলেছে। ভারী মিঠে লেগেছে সেতারের সেই বাদ্যি!

মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নও দেখেছেন অনন্তরাম। একবার মনে হল—তিনি মাছ ধরতে নেমেছেন পুকুরে—ঠিক ছেলে বেলাকার মতো। রাশি রাশি কৈ-মাছ তাকে ছেঁকে ধরেছে। এক্ষুণি কাঁটা ফুটিয়ে দেবে পায়ে। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন—জল থেকে উঠে আস্‌তে। কিন্তু পুকুর ঘাটের সাওলাগুলো এমনভাবে তার পায়ে জড়িয়ে ধরেছে যে, তিনি কিছুতেই সেগুলো ছাড়িয়ে ওপরে উঠে আস্‌তে পারছেন না! কৈ-মাছগুলো চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে। এক্ষুণি কাঁটা ফুটিয়ে দেবে.....

এমন সময় তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। দেখা গেল,—পা থেকে সাওলা ছাড়াতে প্রাণপণে চেষ্টা করায় তিনি বিছানা থেকে মেঝেতে পড়ে গেছেন। একটা অস্ফুট আর্তনাদ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেই শব্দ শুনে ছুটে এসেছে—জমিদারের খাসচাকর হারানিধি।

—কি হয়েছে কর্তা,—অমন করছেন কেন?

কর্তা কোনো উত্তর দিতে পারছেন না! ঘামে তাঁর সারা দেহ ভিজে গেছে।

হারানিধির সাহায্যে কোনো রকমে তিনি উঠে বস্‌লেন। পিপাসায় গলা কাঠ হয়ে গেছে। গলা দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না। বহু চেষ্টা করে বল্লেন,—আমায় এক গেলাস জল দেত' হারানিধি—

হারানিধি ছুটে গিয়ে কুঁজো থেকে ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে নিয়ে এলো।

ঢক্ ঢক্ করে সেই শীতল জল পান করায় অনন্তরামের দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জমিদারবাবু জিজ্ঞেস করলেন,—ক'টা বেজেছে দেখতো হারানিধি—হারানিধি ঘড়ি দেখে বল্লে, আজ্ঞে, আড়াইটে বেজেছে কর্তা—

জমিদারবাবু আবার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ ধরে এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। বৌমা নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে। অবশ্য ডাক্তারবাবু বলেছেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। প্রসূনরাম যদি এই সময়ে বাড়িতে থাক্‌তো তাহলে হয়ত তিনি নিশ্চিন্তে খানিকটা ঘুমুতে পারতেন। জমিদার অনন্তরামের শয্যা যেন কণ্টক হয়ে উঠল।

এপাশ-ওপাশ করতে করতে বৃষ্টির ঝিম্‌ঝিম্ শব্দে কখন যে জমিদারের দুই চোখে আবার ঘুম নেমে এসেছে—সে কথা কর্তা কিম্বা ভৃত্য কেউ জানতেও পারে নি!

এইভাবে কতক্ষণ তিনি ঘুমিয়েছেন ঠিক বুঝতেও পারেন নি।

হঠাৎ দাইয়ের হাঁক-ডাকে অনন্তরামের ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে থেকে দরজা ধাক্কাচ্ছে —দাই। হারানিধি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ওকে আর ডাকাডাকি না করে কর্তা নিজেই উঠে দরজা খুলে দিলেন।

দাইয়ের মুখে-চোখে হাসি উপচে পড়ছে। গড় হয়ে প্রণাম করে বল্লে, কর্তা, শুভ-সংবাদ দিচ্ছি। আমার কিন্তু সোনার গয়না চাই—

কর্তার চোখ থেকে তখনো ঘুম কেটে যায়নি! ঘুম কি জাগরণ—তিনি ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না! এও কি স্বপ্ন নাকি?

জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর বল—

—আজ্ঞে, আপনার পুতি হয়েছে। ছেলে বেশ বড় সড় হয়েছে।

—তাই নাকি রে? খুব ভাল খবর। আনন্দের খবর—এই নে একটা গিনি। আমি বালিশের তলাতেই রেখে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, যে আমাকে প্রথম সুসংবাদ দেবে তাকেই এই গিনি দেবো।

দাইয়ের মুখের হাসি আর ফুরোয় না। বল্লে, কর্তাবাবু, আপনার দেয়া গিনি মাথায় করে নিলাম। কিন্তু এই বল্‌ছি আমি—সোনার গয়না না দিলে হবে না।

জমিদারবাবু এইবার ভালো হয়ে বস্‌লেন। বল্লেন, হবে রে হবে। এই হারানিধি,

উজবুগ—পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে দেখনা। ওরে ওঠ রে, এক ছিলিম তামাক ভালো করে সেজে দে আমায়—

তারপর হঠাৎ কি মনে পড়তে জমিদারবাবু চীৎকার করে উঠলেন, অ্যাঁ, ক'টা বেজেছে ঘড়িতে? ঠিক সময়টা দেখে নেয়া হয়েছে ত?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেন, চারটে বাজ্‌তে দশ মিনিট বাকি।

দাইয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সোনার গয়না ত চাইছিস্,—ঠিক কটার সময় আমার নাতির ঘরের পুতি হল—ঘড়িটা দেখেছিস ত? পাছে ঘড়ি দেখতে ভুল হয়—সেই-জন্যে বৌমার শিয়রে একটি টাইমপিস বসিয়ে রেখে এসেছি—

কর্তার মুখের কথা শুনে দাইয়ের মুখটা যেন শুকিয়ে গেল। তবু বল্লে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি কর্তা; ঠিক সোয়া তিনটের সময় ছেলে হয়েছে।

কর্তা আশ্বস্ত হয়ে বল্লেন, সোয়া তিনটে! বেশ বেশ! আমি খাতায় সময়টা টুকে রেখেদি। আবার বাচস্পতি মশাইকে দিয়ে পুতিটার ঠিকুজী তৈরী করাতে হবে কিনা!

কর্তার হাঁকে ডাকে ততক্ষণ হারানিধির ঘুম ছুটে গিয়েছে। সে নতুন করে অম্বুরী তামাক সাজিয়ে কল্‌কে পাল্‌টে দিয়ে গেছে।

কর্তা বিছানার ওপর উঠে বসে নলে একটু একটু করে টান দিচ্ছেন। হঠাৎ বলে বসলেন তাইত! আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি! আমার বৌমা কেমন আছেন? —বৌমা খুব ভাল আছেন।

একগাল হেসে উত্তর করলে দাই, তারপর কর্তাকে আবার গড় হয়ে প্রণাম করে আঁতুর ঘরের দিকে চলে গেল।

পর দিন সকালবেলা সানাইয়ের শব্দে জমিদারবাবুর ঘুম ভেঙে গেল।

নায়েবকে আগে থেকেই বলা ছিল,—ছেলে হলে নহবৎখানায় সানাই বাজাবে। এসব ব্যাপারে নায়েব—পীতাম্বর দত্ত—ধরে নিয়ে আসতে বল্লে বেঁধে নিয়ে আসে! রাতারাতি খবর পেয়ে সে এর মধ্যেই সানাইওয়ালাকে বসিয়ে দিয়েছে। এই জন্যেই পীতাম্বরকে কর্তার এত ভাল লাগে। সারা গ্রামকে জানিয়ে দিতে হবে জমিদার অনন্তরামের বংশধর হয়েছে। তা সে কাজে কোনো ত্রুটি রাখেনি পীতাম্বর। সানাইয়ের শব্দেই গোটা গ্রাম জেনে গেছে—জমিদার বাড়ির মধুর সন্দেশটি কী!

অনন্তরামের মনে পড়ল আজকের দিনে—তাঁর সব চাইতে বড় দায়িত্ব—আর কর্তব্য হচ্ছে পুতির মুখ দেখা। সে ব্যবস্থাও আগে থেকে করা আছে। হীরে বসানো বালা দিয়ে তিনি বংশধরের মুখ দেখবেন। সে বালা তৈরী হয়ে সিন্ধুকে রয়েছে। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে ঠাকুর ঘরে কোনো রকমে প্রণামটা সেরেই তিনি আঁতুর ঘরের দরজার সামনে এসে হাজির হলেন—।

হাঁক দিলেন, কৈ রে,—দরজাটা একবার খোল। আমার পুতির মুখখানি একবার দেখে যাই—নইলে সারাদিন আর কোনো কাজে মন বস্‌বে না।

দাই এসে দরজা খুলে দিয়ে শুধোলে, কর্তাবাবু, কি দিয়ে পুতির মুখ দেখবেন?

কর্তাবাবু হাসি মুখে হীরে বসানো বালাজোড়া ওর হাতে তুলে দিলেন।

তারপর একটু মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন বোধ করছ বৌমা?

বৌমা মাথার ওপর আঁচলটা তুলে দেবার চেষ্টা করে উত্তর দিলে, ভালো আছি দাদু। একটু চুপ করে থেকে খাটো গলায় জিজ্ঞেস্ করলে, আপনি কি কল্‌কাতায় একটা খবর দিয়েছেন?

কর্তা বল্লেন, ঠিক! ঠিক! ভালো কথা মনে করেছ বৌমা। আমি এক্ষুণি বৈঠক-খানায় গিয়ে প্রসূনরামের নামে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার আগে আমার বংশধরকে একবার চোখের দেখা দেখে যাই—

নক্সাকাটা কাঁথায় শুইয়ে দাই নবজাত শিশুকে সাম্‌নে এনে হাজির করল। সুন্দর ফুটফুটে ছেলে, একমাথা কোঁকড়া চুল। মুখে হাসিটি লেগেই আছে।

কর্তা বল্লেন, চমৎকার হয়েছে ত বিচ্ছুটা……আচ্ছা, আমি এক্ষুণি গিয়ে কলকাতায় একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিচ্ছি। এবেলার মধ্যেই পেয়ে যাবে শ্রীমান। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। হ্যাঁ, ভালোকথা, ডাক্তারবাবু এসে একবার দেখে গেছেন?

দাই উত্তর দিলে, ডাক্তারবাবুকে খবর পাঠানো হয়েছে। তিনি এক্ষুণি এসে পড়বেন।

খুশি মনে কর্তা একটা গানের কলি ভাজতে ভাজতে বৈঠকখানার দিকে পা চালিয়ে দিলেন।

বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখলেন,—গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর অনেক বিশিষ্ট লোক ফরাস জমিয়ে বসে আছেন।

সবাই আনন্দে আত্মহারা। বল্লেন, সানাইয়ের শব্দে শেষরাত্রেই সুখবরটা পেয়ে গেছি—।

এখন আমরা দল বেঁধে এসেছি মিষ্টি মুখ করতে। —নিশ্চয়—নিশ্চয়

হাসিমুখে কর্তামশাই নায়েব পীতাম্বরের মুখের দিকে তাকালেন। এ সব ব্যাপারে পাতাম্বরের আয়োজনের কোনো ত্রুটিই থাকে না। ইঙ্গিত পেয়ে ভৃত্যরা রেকাবী ভর্তি করে রসগোল্লা আর কাচাগোল্লা এনে হাজির করলে।

তখন একেবারে কথা বন্ধ। কেননা মুখ চলেছে সবাইকার।

কর্তামশাই সেই দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হেসে বল্লেন, আপনারা সবাই আমার বংশধরকে আশীর্বাদ করে যাবেন।

সবাই সোল্লাসে ধ্বনি করে উঠলেন। কিন্তু মুখ একেবারে ভর্তি থাকার দরুণ ভালো করে কারো মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না।

কর্তাবাবু পীতাম্বর নায়েবের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, একবার বাচস্পতি মশাইকে খবর দাও ত! জন্ম সময়টা ওকে জানিয়ে দিতে হবে।

—হ্যাঁ, আমি এক্ষুণি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। ব্যস্ত হয়ে পীতাম্বর নায়েব বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তারপর একজন পাইককে ডেকে তাড়াতাড়ি বাচস্পতি মশাইকে ডেকে আনতে পাঠিয়ে দিল।

কর্তামশাই ভোজনরত ব্রাহ্মণদের দেখে মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে লাগলেন।

সবাই এক গ্লাস করে জল পান করে উদগার তুলে কাচাগোল্লা ও রসগোল্লার প্রশস্তি উচ্চারণ করলেন এবং নবজাত শিশুর দীর্ঘ জীবন কামনা করে—আগত অন্নপ্রাশনের কথাটা কর্তামশাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রস্থান করলেন।

এইবার কর্তামশাই ঠাণ্ডা মাথায় তাকিয়াটা টেনে নিয়ে ভালো হয়ে বস্‌লেন। খাস

চাকর নিধিরাম—তামাক সেজে গড়গড়ার নলটা কর্তার হাতে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, তিনি বল্লেন, ওরে আমার পুতি হবার খবরটা প্রসূন বাবাজীকে টেলিগ্রাম করে কলকাতায় জানাতে হবে। তুই পোস্টাপিসে ছুটে যা—পোস্টমাস্টারবাবুকে সুখবরটা দিস্। তিনিই গুছিয়ে লিখে টেলিগ্রাম করে দেবেন। পাতাম্বরের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে যা—

—যে আজ্ঞে বলে নিধিরাম ছুটে হুকুম তামিল করতে চলে গেল।

কর্তাবাবু নিজের ব্যক্তিগত খাতাটা টেনে নিয়ে খাগের কলমে খস্ খস্ করে লিখলেন।

আজ রাত্রি সোয়া তিন ঘটিকায় আমার একমাত্র নাতি শ্রীমান প্রসূন কুমারের পুত্র সন্তান লাভ হইল। ১০ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩২৮সাল। গ্রাম—জরুলগাছি, পরগণা—হিজল গাছি, জেলা—হুগলী। শ্রীঅনন্তরাম দেব শর্ম্মণঃ

নিজের নাম স্বাক্ষর করে কর্তামশাই কলম রেখে দিলেন।

ঘর নির্জন দেখে এই সময় নায়েব পীতাম্বর তার চাদরখানি গলায় জড়িয়ে অতি বিনীত-ভাবে সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর মাথা চুল্‌কে, এদিক ওদিক তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বল্লে, কর্তামশাই, আমার বক্‌শিশটা—কর্তামশাই বল্লেন, হবে পীতাম্বর হবে। কাউকে আমি বঞ্চিত করবো না। আর তাছাড়া তুমি ত' ঘরের লোক। আমার ডান হাত—

অতি আনন্দে পীতাম্বর কাষ্ঠহাসি হাসতে লাগলো।

এমন সময় অন্দর মহল থেকে একটি দাসী মাথায় ঘোমটা টেনে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো—

কর্তামশাই তাকিয়ে দেখলেন বৌমার খাসদাসী চিন্তা এসে দাঁড়িয়েছে।

কর্তামশাই শুধোলেন, কি চিন্তে, তোমার ও কি বক্‌শিশ চাই নাকি?

চিন্তা খাটো গলায় উত্তর দিলে, আজ্ঞে কর্তা, আমি বৌমার কাছে বক্‌সিশ না চাইতেই পাই। কিন্তু আমি সেজন্যে আসিনি। বৌমা আমায় পাঠিয়ে দিলেন—

ব্যস্ত হয়ে কর্তা জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কেন? কি দরকার বৌমার? আমি এক্ষুণি আনিয়ে দিচ্ছি—

চিন্তা বল্লে, কিছু আনতে হবে না। বৌমা জিজ্ঞেস করলেন, নতুন খোকার নাম কি হবে?

কর্তামশাই আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

তাইত! তাঁর বংশধরের নাম কি হবে? একথা ত' একবারও ওর মনে জাগে নি!

বৌমা সত্যিই বুদ্ধিমতী! নামটা আগে স্থির করতে হবে বৈ কি! কি নাম তিনি রাখবেন পুতির? নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে বসন্ত—কি—প্রশান্তরাম? অথবা নাতির নামের সঙ্গে মিলিয়ে আধুনিক কোনো নাম? নাঃ আগে বাচস্পতি মশাই আসুক,—কল্‌কাতা থেকে প্রসূন ফিরে আসুক, তারপর নামের মেলা বসিয়ে দেবেন তিনি!— [চল্‌বে]

॥ দীর্ঘজীবি কারা? ॥

বর্তমান দুনিয়ায় কোন প্রাণীর সব চেয়ে বেশী দিন আয়ু বলতো? হ্যাঁ, চিড়িয়াখানায় গিয়ে যে বুড়ো কচ্ছপও লোকে দেখে তোমরা সব হাসিতে ফেটে পড়ো, ওদেরই জাত-ভাই "গ্যালাপোগী" দ্বীপের কচ্ছপরাই এই দুনিয়ার দীর্ঘজীবি প্রাণী। প্রায় তিনশ' থেকে চারশ' বছর ওরা বেঁচে থাকে। আর, এক একটির ওজন? তা, পাঁচ মণ থেকে ছয় মণ!

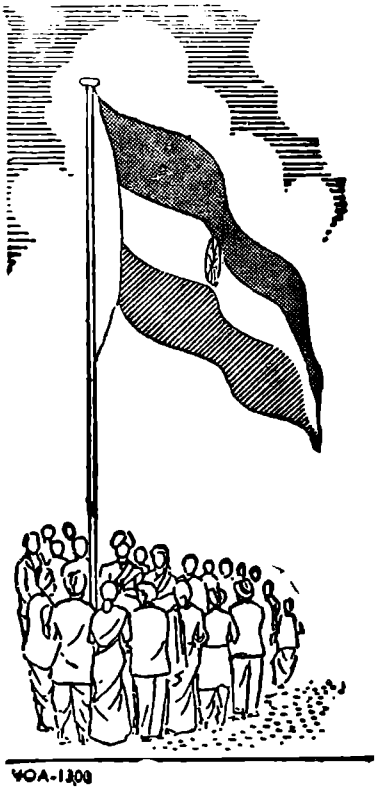

পনরই আগস্ট

রবীন্দ্রনাথ সরকার

জাতীয় জীবনে একেকটি দিনের গুরুত্ব অপরিসীম, আমরা কাব্য করে বলি 'স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার দিন।' পনরই আগস্ট এমনি এক দিন—১৯৪৭ সনে এই দিনে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। এবারের পনরই আগস্ট তারিখে তাহলে স্বাধীনতার তের বছর পূর্ণ হল।

১৯৪৭ সনের আগস্টে দেশের স্বাধীনতা লাভ করার অর্থ, তার আগে দেশ পরাধীন ছিল। সে পরাধীনতার ইতিহাস তোমাদের সকলেরই কমবেশী জানা। ভারতের জাতীয় জীবনের সেই অধ্যায় কলঙ্ক, গ্লানি ও অমর্যাদার। একটি অধিকতর শক্তিশালী দেশ যখন আরেক দেশের উপর হামলা চালায়, তাদের স্বাধীনতা রক্ষার আপ্রাণ প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেলে দেশ ও শাসনশক্তি দখল করে নেয়, তার মধ্যে অমর্যাদার বেদনা থাকলেও কলঙ্ক থাকে না, গ্লানি থাকে না। কিন্তু ইংরেজের এদেশ দখলের কাহিনী তেমন সোজাসুজি সংগ্রামের কাহিনী নয়। তার মধ্যে ওপক্ষে যেমন শঠতা প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র আছে, এপক্ষেও তেমনি আছে আত্মকলহ বিচ্ছিন্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা। তাই সেদিনের বিচ্ছিন্ন ভারতে স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায় এককভাবে অনেকের সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গ মহনীয় হলেও, সমগ্রভাবে জাতীয় চরিত্র জাতির ইতিহাসকেই কলঙ্কিত করেছে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধজয়ে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের পত্তন; ১৮৫৭ সনের সিপাহী-

বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতার লড়াই বলে কথিত। এই বিদ্রোহেও আগেকার দিনের সব দুর্বলতা প্রকট,—সেই অনৈক্য, অসহযোগিতা, আত্মপরায়ণতা ও একনেতৃত্বে আস্থার অভাব। তারপর ধীরে ধীরে অবস্থা বদলেছে, সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ, সেই সঙ্গে ঐক্যবোধ জেগে উঠেছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে একজন রাজা মহারাজা বা নবাব বাহাদুরের ব্যক্তিগত আক্রোশের স্থলে সার্বজনীন জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন ঘটেছে। আর পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদের জাগরণ অর্থই জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রাম। সেই বিপ্লবে ক্রমশ বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। কত দুঃখ পীড়ন নিষ্পেষণের বাধা, কত ত্যাগ, সঙ্কল্প আর শহিদদের আত্মবলিদানের গৌরবময় প্রেরণা! সেই প্রেরণার জয় ঘটেছে ১৯৪৭ এর পনরই আগস্ট।

এখানে এই বিগত দু'শ বছরের ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমরা যারা কিশোর তরুণ, তারা ক্রমে ক্রমে সে ইতিহাস পড়বে, কোথায় আমাদের জাতীয় দুর্বলতা তা আবিষ্কার করে দূর করবে, আর কোথায় শক্তি তাও জেনে তাকে আরও সংহত ও দৃঢ় করে তুলবে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেও দুর্বলতা ছিল বৈকি, না হলে এক স্বাধীনতা রক্ত-ধারায় সীমাঙ্কিত হয়ে দুই স্বাধীনতা হয়ে দেখা দিত না, দেশ ভাগ হয়ে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নির্বিরোধ মানুষের আর্ত কান্নায় দেশের আকাশ আজও ভারী হয়ে থাকত না!

আজ সে কথা থাক। বলছিলাম পনরই আগস্টের কথা, স্বাধীনতা দিবসের কথা। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা বলতে সত্যি কী বুঝি আমরা? দেশ বলতে কি বুঝি সাগর-পর্বত বেষ্টিত দেশের ভূমি? আর দেশের ভূমিই যদি দেশ হয় তবে সেই ভূমির স্বাধীনতার অর্থ কী? একটি কাল্পনিক উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক ভারতমহাগরের বুকে এক বৃহৎ দ্বীপ—নানা আরণ্য সম্পদে খনিজে সে দ্বীপ সমৃদ্ধ। নানা শ্রেণীর প্রাণীও আছে দ্বীপের অরণ্যে, কিন্তু মানুষের বাস নেই সেখানে। কল্পনা করা যাক মহাসাগরের তীরবর্তী কোন দেশের মানুষ জাহাজে করে সেই দ্বীপে গিয়ে নামল, অরণ্য কেটে জনপদ বসাল, পত্তন করল নতুন এক রাজ্যাংশের। সেই দ্বীপটি কি পরাধীন হল?

সহজ বুদ্ধিতে তোমরা বলবে, তা কি করে হবে, দ্বীপে তো আর মানুষ ছিল না! সত্য কথা। দ্বীপের ভূমি, তার উপরের নিচের সম্পদ অপ্রয়োজনে পড়ে ছিল, তা যদি কারও প্রয়োজনে লাগে সেতো মানুষেরই লাভ। কিন্তু ঐ দ্বীপে মানুষের বাস থাকলে এক্ষেত্রে অবস্থা উল্টো হয়ে দাঁড়াত, আমরা বলতাম দ্বীপদেশটি পরাধীন হল, ঐ মহাদেশীয় জাতিটি ওদের

স্বাধীনতা হরণ করল। তাহলে কথাটা দাঁড়াল এই যে আমরা যখন দেশের স্বাধীনতা পরাধীনতার কথা বলি, জানি লোকে বুঝবে দেশের অধিবাসী মানুষের কথাই বলছি। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশের ভূমি ও মানুষ দুয়ে মিলেই দেশের অখণ্ড সত্তা। দেশহীন মানুষের (যেমন যাযাবর বেদে, জিপসি, বেদুইন প্রভৃতি) স্বাধীনতা যেমন অফলপ্রসূ, পরাধীনতাও তেমনি অবাস্তব, কারণ ওদের যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা হরণ করে কারও কোন লাভ নেই, যদি না ওরা তাদের ক্ষতির উদ্দেশ্যেই ঘুরে বেড়ায়।

এবার তোমাদের সামনে আরও একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরা যাক। পরাধীনতাকে আমরা বলি অভিশাপ, স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য। কিন্তু কেন? সেকালে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত। বিদেশী রাজা কোন রাজ্য আক্রমণ করলে সেখানকার রাজা দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতেন, প্রজারাও অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করত। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজারা ইতিহাসে দেশপ্রেমিক বলে কীর্তিত হয়ে আসছেন, তাঁদের ত্যাগের পরিমাণানুসারে তাঁরা আজও সকল মানুষের পূজা পান। কিন্তু এমনতো বহু ক্ষেত্রেই হওয়া সম্ভব যে আক্রান্ত দেশের রাজা ছিলেন অদক্ষ শাসক, প্রজাপীড়ক, বিলাসী, অমিতাচারী ইত্যাদি; আর আক্রমণকারী সকল দিক দিয়েই ছিলেন তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তাই বলে বিদেশী বা বিজাতীয় মহান দিগ্বিজয়ীকে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া কেউ অভ্যর্থনা করে নেয়নি।

একালে অধিকাংশ দেশ থেকে রাজা মহারাজাদের উচ্ছেদ হয়েছে, সর্বত্রই প্রচলিত হয়েছে গণতান্ত্রিক শাসন। যে দু'চারটি দেশে আজও রাজা আছেন সেখানেও শাসন ব্যাপারে প্রজার অধিকার স্বীকৃত। এই গণশাসিত যুগেও যে সব রাষ্ট্র অন্য দেশের উপর হামলা করে বা দখল বজায় রাখে তাদের বলি আমরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অধিকৃত দেশের চেয়ে উন্নততর,—তারা শাসনদক্ষ, শিল্প বাণিজ্যে প্রাগ্রসর, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান তাদের করায়ত্ত। তথাপি অনুন্নত দেশগুলি তাদের অধীনে থাকতে অস্বীকৃত কেন? অনেক মৃত্যুপণ করেও কেন তারা স্বাধীনতালাভে সচেষ্ট?

এর জবাব অতি সহজ। সেকালের রাজাবাদশাই হোক বা একালের সাম্রাজ্যবাদী দেশই হোক—যারাই পররাজ্য আক্রমণ করে তাদের উদ্দেশ্য লুণ্ঠন; আর সে রাজ্য দখল করে রাখলে তার উদ্দেশ্য শোষণ। দিগ্বিজয়ী রাজাবাদশাদের পররাজ্য লুণ্ঠনের অনেক নির্মম ইতিহাস তোমরা পড়েছ। একালের ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, স্পেনীয়, পর্তুগীজ প্রভৃতি

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কি হিংস্র নির্মমতায় অধিকৃত দেশগুলির সম্পদ শোষণ করে তাদের পাংশু করে ফেলেছে, আজও ফেলছে—সে ইতিহাসও কিছু কিছু নিশ্চয় পড়ছ। অতীতের আক্রমণকারীরা মানুষ মেরে কেটে, নগর জনপদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান করে সোনা রুপা ধনরত্ন লুট করে নিত। সে উৎপীড়ন চলত সোজা রাস্তায়। এযুগের বর্বরতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভদ্রবেশী। অগ্রসর শিল্পশক্তির প্যাচে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কূট কৌশলে এবং আরও বহুবিধ ছলনার আশ্রয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অধিকৃত, এমন কি অনধিকৃত দেশেরও সম্পদ শোষণ করে চলেছে। বাধা পেলেই তাদের ভদ্রতার মুখোস খসে পড়ে, বর্বরতা প্রকাশ্য রূপ নেয়।

ফলে এই সব অনগ্রসর দেশগুলির অজস্র সম্পদ স্বদেশের মানুষের প্রয়োজনে লাগে না, সাতে ভূতে লুটে খায়। অন্ত থাকে না তাদের দুঃখ দুর্দশার। তাই প্রয়োজন স্বাধীনতার। স্বাধীনতা নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণের অধিকার। সেই যে নির্দিষ্ট সীমা-চিহ্নিত ভূমি আর তার মানুষ মিলে দেশের অখণ্ড সত্তা, তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ স্বাধীনতার লক্ষ্য। দেশের বা জাতির এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কী বস্তু ?

এই বিকাশের একদিকে দেশের বৈষয়িক অগ্রগতি—শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির প্রসার, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি এবং আরও হাজারো অনুরূপ ব্যবস্থা। এসবের মারফত হবে মানুষের দারিদ্রমোচন, কর্মসংস্থান, অন্নবস্ত্র ও বাসগৃহের সমস্যার সুরাহা। আধুনিক বিজ্ঞানের দেওয়া নানা কল্যাণকর উপকরণ মানুষের হাতে তুলে দিয়ে তাদের জীবন নীরোগ স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর করে তোলাই জাতির বৈষয়িক অগ্রগতির লক্ষ্য। জাতীয় প্রগতির আরেক দিকে মানসিক বিকাশ। মানুষের বাঁচাতো শুধু খাওয়াপরাতে আর দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যে নয়। তার দেহের ক্ষুধা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার মনের ক্ষুধা। এই ক্ষুধা মেটাবার জন্য তার শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা। জাতির ভাষাসাহিত্য শিল্পকলা সঙ্গীত নৃত্যের মধ্যে তার চিৎপ্রকর্ষ ভাস্বর হয়ে ওঠে। কালাগত সংস্কৃতির ধারা জীবন-যাপনের নিজস্ব রীতি —জাতির বিশিষ্ট প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে এদের পরিপূর্ণতা। সহজেই বুঝা যায় জাতির বৈষয়িক ও মানসিক বিকাশ একে অন্যের পরিপূরক, একটি ছাড়া আরেকটি অর্থহীন। স্বাধীনতা এই উভয় বিকাশের প্রতিশ্রুতি।

সেই স্বাধীনতা এসেছে ১৯৪৭ সনের পনরই আগস্ট তারিখে। কিন্তু স্বাধীনতার

সংগ্রামে যারা যোগ দিয়েছিল তারা কি চেয়েছিল নিজেরা সুখী হতে? তা নয়। তারা যখন দুঃখ বা মৃত্যু বরণ করেছে তারা চেয়েছে দেশের সকল মানুষ, তাদের উত্তর পুরুষ পুরোপুরি বাঁচবে, জীবনকে উপভোগ করবে, সুখী হবে দেশের সকল মানুষ, সমাজের একাংশ নয়। স্বাধীনতার ফসলে প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার। অন্ন বস্ত্র কর্ম বাসস্থান সব পাবে তারা, পাবে সন্তান সন্ততিকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের সুযোগ, ভোগ করবে অবসর বিনোদনের জন্য সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পের সেরা দান—এক কথায় প্রতিটি নাগরিকের জীবন-যাত্রার মান দিনে দিনে উন্নততর হবে। তা যদি না হয়, দেশের বর্ধমান সম্পদ যদি সমাজের একাংশের হাতে জমে আর তার বৃহত্তম অংশ আরও ক্লিষ্ট, আরও শীর্ণ হয়, তাহলে স্বাধীনতা হবে নিষ্ফল, শহিদের আত্মদান হবে ব্যর্থ। এমন যদি হয় তবে তার পাপ যেমন দেশের মানুষের, সেই পাপমুক্তির দায়িত্বও দেশের মানুষের। যে-বিপ্লব বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে, সেই বিপ্লবই স্বদেশী পুঁজিবাদের হাত থেকেও মানুষের অধিকার ছিনিয়ে আনে। একে গণতন্ত্র সমাজবাদ সাম্যবাদ যা খুশী বল, তাতে কিছু যায় আসে না। নিঃসন্দেহে এই অধিকারই স্বাধীনতা—আর তোমরা দেশের তরুণ তরুণী, কিশোর কিশোরী সেই স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। পনরই আগস্ট তাই যেমন উৎসবের দিন, আনন্দের দিন, তেমনি সঙ্কল্পের দিন প্রতিজ্ঞারও দিন—স্বাধীনতা যেন ব্যর্থ না হয়।

॥ শরতের কবিতা ॥

গোবিন্দ প্রসাদ বসু

নরম সোনালী রোদ ঝরে ঝুর্ ঝুর্,
কাশবনে রুন্-ঝুন্ হাওয়ার নূপুর !
দীঘিটার আয়নায় আকাশের নীল,
ঘাসে ফুলে শিশিরের হীরে ঝিল্‌মিল্ !
রঙ্-পাখা প্রজাপতি নাচে আঙিনায়,
পদ্মের বনে বনে মৌমাছি গায় ।
চারদিক ভুর্-ভুর্ শিউলির বাস,
শরতের চিঠি নিয়ে হাস্‌ছে আকাশ !
বাউলের হাতে বাজে মিঠে একতারা—
প্রাণে প্রাণে আজ তাই মেতে ওঠে পাড়া ॥

এমন হয় নাকি

ধীরেন্দ্রলাল ধর

বিমল মোটর চাপা পড়লো।

অজানা অচেনা লোকের মোটরে নয়, পাড়ার লোকের মোটরে।

সুধীরবাবু এটর্ণী। এই গরীব পাড়ায় তিনিই একমাত্র বড়লোক। এই পয়সা তার নিজেরই উপার্জিত। পৈতৃক একখানা বাড়ি ছিল মাত্র। এটর্ণী হয়েই সুধীরবাবু ঠিক করলো, যেভাবেই হোক পয়সা কামাবে। আইনের ফাঁকে মিথ্যা কথা, জুয়াচুরি, ঠকানো প্রবঞ্চনা কিছুই বাদ গেল না,—মোটর গাড়ী হলো, কয়েকখানা ভাড়াটে বাড়ি হলো। পয়সার সঙ্গে সঙ্গে বাড়লো প্রতিপত্তি। তা বাড়ুক, কিন্তু মুস্কিল বাধলো, যেদিন থেকে সুধীরবাবু নতুন গাড়ী কিনে নিজে চালাতে সুরু করলে।

এপাড়ায় গাড়ী ঘোড়া বেশী চলে না, ছেলেরা বিকালের দিকে পথেই খেলাধুলা করে। সুধীরবাবু হুস করে গাড়ী নিয়ে এসে ঢোকে, ছেলেরা থমকে উঠে সরতে না সরতে গাড়ী চলে যায়। বয়স্কদের বুক দুর দুর করে ওঠে, দু-একজন বলেন—সুধীরবাবু গলির মধ্যে গাড়ীটা একটু আস্তে চালাবেন।

সুধীর একটু ভারিক্কী চালে বলে—এ গাড়ী এর চেয়ে আস্তে চলে না।

—ছেলেপুলেরা খেলাধুলা করে যদি একটা কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়……

—কি করতে পারি বলুন, ওদের রাস্তায় খেলতে নিষেধ করে দিন। পথটা তো খেলার মাঠ নয়!

আর কথার অপেক্ষা না রেখে সুধীর উপরে উঠে যায়, যারা বলতে যায় তারা অপমান বোধ করে। ছেলেদের নিষেধ করে কিন্তু ছোটরা শোনে না। কাছাকাছি কোন মাঠ নেই, বিকেল বেলা তারা একটু হৈ-হুল্লোড় করবেই।

কাজেই বয়স্করা যে ভয় করছিল তাই সত্য হলো। বিমল যেদিন বল ধরতে গিয়ে একেবারে এসে পড়লো মোটরের সামনে। সামনের বাম্পারে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো।

সুধীরও ব্রেক কষে মোটর থামালো। বিমল চাকার নীচে পড়লো না বটে, কিন্তু পড়ে গিয়ে সে জ্ঞান হারালো।

—বার বার বলি পথে খেলবি না, তবু হতভাগাগুলো……

আরো কি বলতে গিয়ে সুধীর থেমে গেল, চারপাশে ছেলেছোকরার চোখগুলো জ্বলছে। হয়তো এখনি গায়ের চামড়াটা কতটা শক্ত তা তারা দেখে নেবে। বুদ্ধিমান এটর্ণী তখনই বিমলকে মোটরে তুলে নিয়ে হাসপাতালে রওনা হলো।

বিমলের জ্ঞান হলো রাত্রে। মাথাটা তখন প্রকাণ্ড হয়ে ফুলে উঠেছে। চোখ চাইল বটে কিন্তু মানুষ চিনতে পারলো না। ডাক্তার বললো—যাক্, ভয় কেটে গেছে।

বিমলের মা ছিল না, মানুষ করেছিল এক বিধবা পিসি। পিসিমা বাইরে বসেছিলেন, ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—বাঁচবে তো?

এ প্রশ্নের জবাব ডাক্তারবাবুর মুখস্ত। বললেন—ভয়ের কোন কারণ নেই, তবে একটু সময় লাগবে।

ডাক্তারবাবু যত সহজে পিসিমাকে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা কিন্তু তত সহজ নয়। বিমলের জ্বর এলো, এবং তারই সঙ্গে দেখা দিল বিকারের ঘোর। ইঞ্জেকসন দেওয়া সুরু হলো, কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হচ্ছে বলে মনে হলো না।

পিসিমা সকাল সন্ধ্যে আসেন। রক্তাভ চোখ মেলে বিমল তাকিয়ে থাকে, চিনতে পারে না। পিসিমার চোখে জল আসে।

পঞ্চম দিন বিকাল বেলা জ্বরটা বোধ হয় একটু কমে। আজ বিমল যেন পিসিমাকে চিনতে পারে, বিড় বিড় করে কি যেন বলতে সুরু করে। পিসিমা মুখের কাছে নত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—আমায় কিছু বলছিস্, বাবা?

বিমল বিড় বিড় করে ওঠে। পিসিমা এবার অস্পষ্টভাবে শুনতে পান কথাগুলো—আমায় চাপা দিয়েছে, আমি মরে যাব!

—কি সব বাজে বকছিস বাবা—পিসিমা বাধা দিয়ে বলেন কদিন পরেই সুস্থ হয়ে উঠবি! ভয় কি?

—আমি মরে যাব। বড়লোক, অনেক পয়সা, এটর্ণী, জোচ্চোর, আমায় মেরে ফেললে! আমিও ছাড়বো না, আমিও ভুলবো না!

পিসিমা যে কথাই বলুন, বিমলের মুখে ওই এক কথা।

ডাক্তার বললেন—জ্বরের জন্য একটু বেঁকে গেছে, ভয়ের কোন কারণ নেই। জ্বর কমলেই সুস্থ হয়ে যাবে।

জ্বর কমে, কিন্তু ডাক্তার যা আসা করেছিলেন তা ঘটে না। আধঘণ্টার মধ্যে জ্বর নেমে এলো আটানব্বুই ডিগ্রিতে। গায়ে ঘাম দিতে সুরু করলো, ডাক্তার কোরামিন দিলেন। কিন্তু, দেহের উত্তাপ রক্ষা করতে পারলেন না। তর তর করে ছিয়ানব্বুই ডিগ্রিতে নেমে গেল। শেষ রাতে বিমল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। পুলিসের গাড়ী ভোর-বেলা বাড়িতে খবর দিয়ে গেল—রোগীর অবস্থা খারাপ, এক্ষুণি আপনারা হাসপাতালে যান!

পিসিমা সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠেছিলেন, মুখে একটু জল দিয়েই ছোট ভাইয়ের হাত ধরে চললেন হাসপাতালে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু। শব ব্যবচ্ছেদ করে মৃত্যুর যথার্থ কারণ নির্ণয় করে তবে পুলিস মৃতদেহ ছাড়বে। পিসিমা হাহাকার করে বললেন—না না, আর চেড়াই ফেড়াইয়ের দরকার নেই।

পুলিস বললো—তাহলে তো কোন প্রমাণ থাকবে না। আপনি মামলা করবেন কি করে?

—কি হবে আর মামলা করে—পিসিমা বললেন—মামলা করলে কি ছেলে আবার ফিরে আসবে? আমি মামলা করবো না।

কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, এই কথা লিখে দিয়ে পিসিমা হাসপাতাল থেকে বিমলের মৃতদেহ বের করে আনলেন।

সুধীরবাবু সব খবরই রাখছিলেন। পরদিন সকালে এলেন পিসিমার সঙ্গে দেখা করতে, বলল—ব্যাপারটায় আমার কোন হাত ছিল না। গাড়ীর সামনে এসে পড়লো, আমি কি করবো বলুন।

পিসিমা বললেন—সবই আমার অদেষ্ট বাবা!

এটর্ণী এবার কথা খুঁজে পেলে, বলল—ওই যা বলেন, নিয়তি। নিয়তির বিরুদ্ধে কারো হাত নেই।

পিসিমার চোখদুটি জ্বলে উঠলো, কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।

সুধীরবাবু পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করলেন। বললেন—আপনাদের অনেক

খরচপত্র হয়ে গেল। এই টাকাটা আমারই দেওয়া কর্তব্য, তাই এই টাকাটা এনেছি আপনি রেখে দিন।

নোটের তাড়াটা সুধীরবাবু এগিয়ে দিলেন।

পিসিমার মুখের চেহারা বদলে গেল, বললেন—কত টাকা?

—দুশো!

—বারো বছরের একটা ছেলের জীবনের দাম দুশো টাকা? আপনি তো এটর্ণী

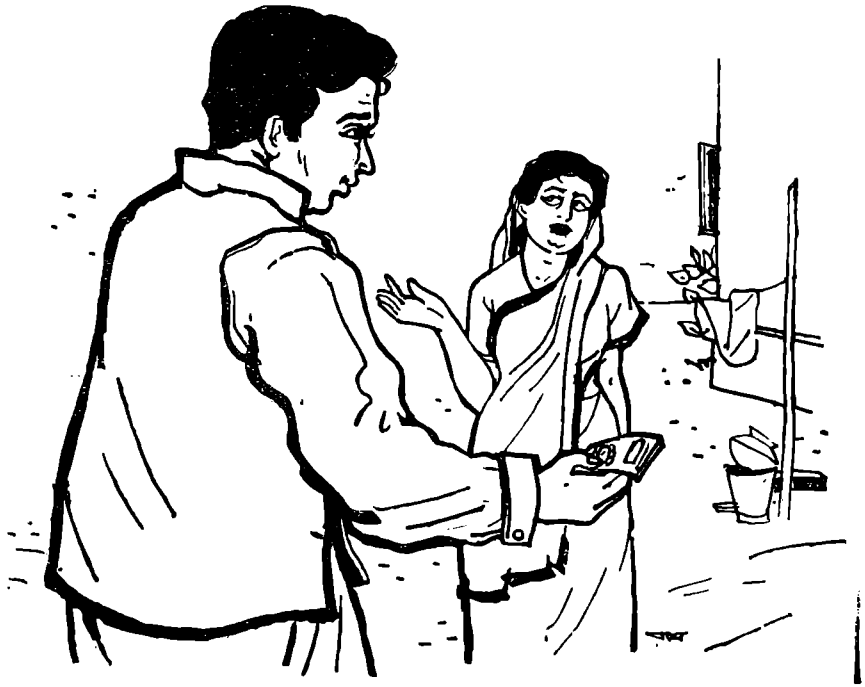

মানুষ, হিসাব করে বলুন তো বারো বছর অবধি একটা ছেলেকে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করতে কত টাকা লাগে? তারপর বড় হলে সে কি হতো আর কতটাকা রোজগার করতো তারও একটা হিসাব করুন। আমার বিমল ছিল ক্লাশের সব-সেরা ছেলে, ফার্স্ট বয়।

—না না তা নয়, আমি তো জীবনের দাম দিতে আসিনি। জীবনের দাম কি কেউ দিতে পারে? আপনাদের আকস্মিক যে খরচপত্রগুলো হয়ে গেল, সেই টাকাটা……

--যারা বারো বছর ছেলের সব খরচ জুগিয়ে এসেছে, এ খরচটাও তারাই জোগাবে, আপনার অপেক্ষায় কেউ বসে নেই। আপনার সমস্ত সম্পত্তি দিলেও বিমলের জীবনের দাম দেওয়া যাবে না। ও টাকা আপনি রেখে দিন, মোটরের পেট্রল কিনবেন। যান।

পিসিমা ভিতরে চলে গেলেন, সুধীরবাবু আর কোন কথা বলার সুযোগ পেলেন না। তা না পান, পিসিমা যে টাকাটা রাখলেন না, এতে তিনি মনে মনে খুশিই হলেন।

ব্যাপারটা সেইখানেই শেষ হবার কথা, কিন্তু তা হলো না।

দিন সাতেক পরে হঠাৎ এক রাত্রে সুধীরবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো পাশের ঘরে কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে। চোর ঢুকলো নাকি? পাশের ঘরে কত মক্কেলের দরকারী কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ থাকে, ওর একখানা চুরী গেলেই তো সর্বনাশ!

সুধীরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। আলো জ্বালালেন না, অন্ধকারে চুপি চুপি খোলা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরটা একবার দেখে নিতে চাইলেন, ব্যাপারটা কি? ঘরের ভিতরে বিশেষ কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না, অন্ধকারটা যেন বড় বেশী জমাট বলে মনে হলো। তবে সেই অন্ধকারের মধ্যে শেল্‌ফে সাজানো দলিলগুলি, কে যেন টেনে বের করে ঘরময় ছড়িয়ে ফেলছে!

সুধীরবাবু তখনই ফিরে গিয়ে এক গাছি লাঠি নিয়ে এলেন। ঝণাৎ করে দরজা খুলেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কালো মত কি একটা যেন টেবিলের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লো নীচে। সুধীরবাবু আলোর সুইস টিপলেন। আলোও জ্বললো আর টেবিলের নীচে থেকে সেই কালো ছায়াটা শাঁ করে সুধীরবাবুর পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। অদ্‌ভূত ঠাণ্ডা তার দেহ, কুকুর কি বেড়াল কি বেঁজী ঠিক ঠাহর পেলেন না। তবে পরক্ষণেই পায়ে একটা জ্বালা তিনি অনুভব করলেন, চলে যাবার সময় সেই প্রাণীটা তার পায়ের উপর দিয়ে লম্বা একটা আঁচড় টেনে দিয়ে গেছে। রীতিমত কেটে গেছে।

কিন্তু সেই কাটার চেয়েও বড় ব্যাপার তখন সুধীরবাবুর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। শেল্‌ফের সমস্ত কাগজপত্র ও দলিল ছেঁড়া, ছড়ানো রয়েছে মেঝের উপর। সুধীরবাবু কি যে করবেন ভেবে পেলেন না, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

সকালবেলা সুধীরবাবু গেলেন ডাক্তারের কাছে। রাতে পায়ে আইডিন দিয়েছিলেন বটে, তবু সারারাত দপ্‌ দপ্‌ করেছে। সকালবেলা বেশ ফুলেছে বলে মনে হলো।

ডাক্তারবাবু দেখে শুনে বললেন—যে জানোয়ারই হোক, ক্ষতটা বিষাক্ত বলে মনে হচ্ছে। কয়েকটা ইঞ্জেকসন নিয়ে নিন্। ভয় থাকবে না।

তখনই প্রথম ইঞ্জেকসন নিয়ে সুধীরবাবু বাড়ি ফিরলেন। নিজেই ভোরবেলা মোটর ছুটিয়ে গিয়েছিলেন, আবার মোটর ছুটিয়েই তিনি ফিরলেন। বাড়ির কাছাকাছি এসেছেন এমন সময় হঠাৎ কি হলো কে জানে, পায়ের ক্ষত স্থানটা কেমন যেন সংকুচিত হয়ে উঠলো। মুহূর্তের জন্য তিনি বেসামাল হয়ে পড়লেন। ঠিক সেই সময় গাড়ীখানি গিয়ে ধাক্কা মারলো ফুটপাতের একটি ল্যাম্পপোষ্টে। মাথায় একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি লেগে সুধীরবাবু চেতনা হারালেন।

সন্ধ্যাবেলা পিসিমা দরজার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন; সুধীরবাবুর চাকর বিশু যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়ালো, বললো—শুনেছেন তো আজ সকালে কর্তাবাবুর মোটর ধাক্কা খেয়েছে, ভেঙে গেছে। কর্তাবাবু হাসপাতালে আছেন, মাথায় খুব চোট লেগেছে। মাথাটা ফুলে উঠেছে, ঠিক আপনাদের খোকাবাবুর মত, এখনও জ্ঞান হয়নি! বোধ হয় বাঁচবে না। আমি তো সেখান থেকেই আসছি।

পিসিমা শুনলেন, বিমলের কথাগুলি তাঁর মনে পড়লো—আমি ছাড়বো না, আমিও ভুলবো না!' এত শীঘ্র বালকের সেই অভিশাপ ফলে যাবে, এমন হয় নাকি!

আমরা কি সব বাতাস-খেকো?

বাতাস ছাড়া এক মুহূর্তও আমরা বাঁচতে পারি না। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে অনবরতই আমরা বাতাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি। কিন্তু কেউ কি জানো, চব্বিশ ঘণ্টায়—অর্থাৎ দিনে-রাতে, আমরা কতটা বাতাস গ্রহণ করি? তোমরা বিশ্বাস করো আর না-ই করো, বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলেছেন, একজন সুস্থ মানুষ দিনে-রাতে কম করে তিন হাজার গ্যালন বাতাস গ্রহণ করে আর ঐ বাতাসের ওজন প্রায় পনের সের!

॥ হারিয়ে গেছি ॥

—বন্দেআলী মিয়া

খোকা যদি খোঁজে আমায় সেথা,
বাইরে ঘরে খোঁজে আমায় আজ।
আমার দেখা কোথাও পাবে না সে,
হারিয়ে গেছি নূতন দেশের মাঝ।
আজ এসেছি অনেক দূরের দেশে
লুকিয়ে আছি সবার আড়াল হয়ে
হেথায় খোকা আসবে নাকো কভু,
আছি যে তাই অনেক ব্যথা স'য়ে।
এইখানেতে একটি কোণে আমি,
বেঁধেছিলাম একটি ছোট ঘর—
পরম সুখে ছিলাম সেথা যে গো
ভাঙলো সে ঘর কালবোশেখীর ঝড়।
দিনের পিছু দিন যে কাটে আজ,
খোকন মোরে খোঁজে সকল বাড়ি;
দূর-বিদেশে একলা ঘরে হেথা—
খোকার লাগি দীঘল নিশাস্ ছাড়ি।
আমার গৃহে খোকা-খুকুর মেলা;
সেই মেলাতে নাইকো আমি আজ।
শূন্য বুকে পথ-বিপথে চলি
আজকে আমার নেই তো কোন কাজ।
নূতন করে কুটির বেঁধেছিলাম
সেথায় আমার হ'লো না তো ঠাঁই,
নিজেই আমি হারিয়ে গেছি-হায়
খোকা-খুকু আমার কাছে নাই।

! ট্রেন আছে ড্রাইভার নেই !

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আজগুবি নয় আজগুবি নয় সত্যিকারের কথা—ট্রেন চলছে ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্, অথচ ড্রাইভার নেই, গার্ড সাহেব নেই। সে ট্রেনের প্যাসেঞ্জার অবশ্য মানুষ নয় কতগুলি চিঠির থলি। রোজ তারা ট্রেনে চেপে যাওয়া আসা করে সাড়ে ছ'মাইল রাস্তা। মাঝখানে স্টেশনে দরকার মত থামে, আবার চলে আপন মনে ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্।

লণ্ডন পোস্ট অফিসের প্রধান কর্মকেন্দ্র যেখানে, সেখানে এই ধরণের ট্রেন দেখলাম সেদিন। জায়গাটির নাম মাউন্ট প্লেসাণ্ট। এ জায়গার একটা বেশ মজার ইতিহাস আছে, সে কথা পরে বলছি।

এই দপ্তরের মাটির নিচে পাতা আছে সাড়ে ছ'মাইল লম্বা এক রেল লাইন। ৪০টি

ট্রেন চলেছে চিঠির থলি নিয়ে

টেন যাতায়াত করে ৪১,০০০ চিঠির থলি নিয়ে এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশনে।

এই ক্ষুদে রেল পথটিতে মোট ৮টি স্টেশন আছে। প্রত্যেক স্টেশনে আছে দুটো করে প্লাটফর্ম। একটি হল সব স্টেশনে থামে এমন ট্রেনের জন্য, অপরটি হল সব স্টেশনে থামে না এমন ট্রেনের জন্য। ট্রেনগুলি চলে ইলেকট্রিকে। একটি ঘরে বসে বোতাম টিপে ট্রেনগুলিকে চালান হয়। এক একটি ট্রেনে থাকে দুটো থেকে তিনটে করে বগি। ওপরের বাছাই অফিস থেকে চিঠির থলি ইলেকট্রিক সিঁড়ি দিয়ে আপনা আপনি নেমে আসে স্টেশনের প্লাটফর্মে। প্লাটফর্মে থাকেন পোস্ট অফিসের কর্মী। ট্রেন এলেই সে বোতাম টেপে। ট্রেন থামতেই থলি নামিয়ে নেয় আর নতুন থলি বোঝাই করে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর আবার বোতাম টিপতেই ট্রেন চলে ঝিক্ ঝিক্ করে পরের স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

চিঠির থলি বোঝাই হল ট্রেনে

পৃথিবীর মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে একমাত্র লণ্ডনেই। এই ব্যবস্থার দরুন তাড়াতাড়ি এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশনে জরুরী চিঠি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

লণ্ডন পোস্ট অফিসের অসংখ্য মোটর ভ্যানও আছে। কিন্তু লণ্ডনের রাস্তাঘাটে সব সময় এমন ভিড় থাকে যে, মোটর ভ্যান অনেক সময় তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারে না, আর শীতকালে লণ্ডনে অধিকাংশ সময় বিশ্রী কুয়াশা পড়ে। রাস্তাঘাটে কিছু দেখা যায় না। যানবাহন

সমস্ত বন্ধ থাকে ; অথচ জরুরী চিঠিতো বন্ধ থাকতে পারে না। এই ট্রেনগুলির সাহায্য তখন অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

লণ্ডনের পোস্ট অফিস ইউরোপের সমস্ত পোস্ট অফিসের চেয়ে বড়। প্রতিদিন লণ্ডনের এক লক্ষ ডাক বাক্সে আট লক্ষ পার্সেল ও ২৬০ লক্ষ চিঠি জমা পড়ে। এই চিঠিগুলিকে যদি একটির মাথায় একটি এমনভাবে সাজিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তা লম্বায় এভারেস্টের চেয়ে চারগুণ উঁচু হবে।

তুমি মাত্র তিন পেনি খরচ করে লণ্ডন শহরের যে কোন চিঠির বাক্সে যেই একটা চিঠি ফেললে, অমনি আধ ঘন্টার মধ্যেই পোস্টম্যান এসে সেগুলি ভ্যানে করে নিয়ে গেল বাছাই অফিসে। বাছাই অফিসে চিঠি আর বিভিন্ন প্যাকেটগুলিকে আলাদা করা হয়। সমস্ত চিঠির মুখ একসঙ্গে করা হয়, তারপর মেসিনের সাহায্যে অতি দ্রুত পোস্ট অফিসের ছাপ মারা হয়।

এরপর হল বাছাইর কাজ। প্রত্যেক কর্মচারীর সামনে আছে এক একটি বিরাট বাক্স, তাতে আছে ছোট ছোট খোপ। সাধারণতঃ ৪৮টি খোপ থাকে, এক একটি বাক্সে। তুমি যে শহরে চিঠি লিখেছ, সেই শহর ও আরও অনেক শহর নিয়ে একটি খোপ আছে। সেই খোপে তোমার চিঠি রাখা হবে। তারপর আবার সেই এক একটি খোপ থেকে নির্দিষ্ট জেলার জন্য চিঠি আলাদা করে রাখা হবে। তারপর কোন কোন শহরে চিঠি যাবে, তা ভাগ করা হয়ে গেলে বাণ্ডিল বেঁধে ট্রেনে, জাহাজে অথবা প্লেনে চিঠি পাঠান হবে। গ্রেট বৃটেনের পোস্ট অফিস বিভাগ বছরে ট্রেন, প্লেন ও জাহাজ ভাড়াই দেয় ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

লণ্ডনের মাউন্ট প্লেসান্টে হল জেনারেল পোস্ট অফিস। ওখানেই হল সমস্ত চিঠির আড়ৎ।

লণ্ডনের মাউন্ট প্লেসান্টে এখন অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় থাকলেও একশ'বছর আগে এ জায়গাটিতে একটি সুন্দর ও বিরাট খেলার মাঠ ছিল। এখন যে জায়গাটিতে পোস্ট অফিসের বিরাট প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে, ওই বাড়িটি অস্টাদশ শতাব্দীতে অপরাধীদের এক জেলখানা ছিল। ১৮৮৭ সালে পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ বাড়িটি কিনেনেন।

আজ মাউন্ট প্লেসান্ট পোস্ট অফিসের বিভিন্ন দপ্তরে ৬৪০০জন কর্মী কাজ করেন। ওপরে পদস্থ কর্মচারীদের অফিস, নীচের সমস্তটা জুড়ে বাছাই ঘর।

এই পোস্ট অফিস থেকে প্রতি দিন ১৪,০০০ চিঠির থলি বিভিন্ন স্থানে যায়। সারা দিন-রাত ধরে এই দপ্তরে কাজ চলে আর প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর ভ্যান বোঝাই করে এখান থেকে বাছাই করা চিঠি নির্দিষ্ট স্থানে চলে যায়।

বৃটেনে খ্রীস্টমাসের সময় অসংখ্য চিঠি বিলি হয়। ঠিক আমাদের দেশে ৺বিজয়া দশমীর মত। প্রতিটি লোক তার পরিচিত বন্ধু, আত্মীয়দের খ্রীস্টমাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি লেখে। হাজার হাজার লোক উপহার পাঠায়। ঐ সময় এই পোস্ট অফিসে দৈনিক ৪০ লক্ষ চিঠি ও ১ লক্ষ প্যাকেট আর ১৮ লক্ষের মত পার্সেল আসে।

পোস্ট অফিসের কর্মীরা চেষ্টা করেন অতি দ্রুত চিঠি পৌঁছে দেবার জন্য, কিন্তু যে সব চিঠিতে ঠিক মত ঠিকানা লেখা থাকে না, সেগুলি নিয়ে বিপদ। শুনে অবাক হবে সারা বৃটেনে দৈনিক যে সব চিঠি পোস্ট করা হয় তার মধ্যে ৮০লক্ষ চিঠির ঠিকানা ঠিক মত লেখা থাকে না। বাছাই অফিসে বিভিন্ন দপ্তর আছে এই সব চিঠির গতি করার জন্য। যে সব চিঠির বাড়ির নম্বর দেওয়া নেই, গ্রাম বা পোস্ট অফিস দেওয়া নেই, বা যে চিঠির প্রদেশের নাম দেওয়া নেই, সেগুলি সব আলাদা আলাদা করে রাখা হয়। একটি মজার দপ্তর আছে, যে সব চিঠিতে কিছুই লেখা থাকে না তাদের জন্য। কর্তৃপক্ষ একটা চিঠি দেখালেন, তাতে খামের ওপর লেখা আছে "ফাদার খ্রীস্টমাস্" আর কিচ্ছু নয়।

ফাদার খ্রীস্টমাসের কাছে চিঠি পৌঁছে দেওয়া আর যাই হক পোস্ট অফিসের পিওনের কর্ম নয়—কিন্তু যে লিখেছে সেকি আর তা বুঝবে!

॥ যে যা নয় সে তা হ'লে ॥

হরেন ঘটক

কাকাতুয়া কাক হ'য়ে
যদি কা কা ডাকতো !
ঘরে তাকে কোন দিন
পুষে কেউ রাখতো ?

কাক যদি তাক্ ক'রে
গুলি ছুঁড়ে মারতো।
উট পাখী উড়ে গিয়ে
পালাতে কি পারতো ?

বাজ পাখী বাজ হ'য়ে
যদি ঘাড়ে পড়তো !
বল দেখি তার ঘায়ে
কে না তাতে মরতো ?

চিল যদি দিল খুলে
ভাটিয়ালী গাইতো !
রেডিওতে তার গান
কে না বল চাইতো ?

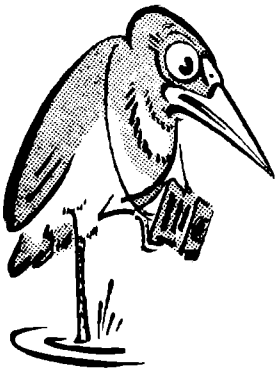

বক যদি সখ ক'রে
বাড়ি গাড়ি করতো !
ঝিলে নেমে খপাখপ্
সে কি মাছ ধরতো ?

বাঘ যদি রাগ ক'রে
প্রাণী মারা ছাড়তো !
নিরামিষ-ভোজী জীব
হ'তে সে তো পারতো ?

ঘোড়া যদি খোঁড়া হ'য়ে
দোরে দোরে ঘুরতো !
বল দেখি এক্কাতে
ক'াকে এনে জুড়তো ?

যে যা' নয় সে তা' হ'লে
কী যে হ'তো দুনিয়া !
চট্ ক'রে জ্যোতিষীরা
বলুক না গুণিয়া ?

রবীন চক্রবর্তী

"রোশনাই" পত্রিকার মলাটে যে পক্ষীরাজ ঘোড়ার ছবি তোমরা দেখছো—সে বেচারা তোমাদের অনেক ঘুরিয়েছে, তাই না? ওর পিঠে চেপে তোমরা এতক্ষণ বেশ মজা করে "রোশনাই" এর যাবতীয় ছড়া, ছবি, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও মজার মজার রাজ্যে বিচরণ করছিলে। কিন্তু এখন ও কোথায় এসে থেমেছে বলতো? "তেপান্তরের মাঠে"। রূপ-কথার তেপান্তরের মাঠকে কিছুক্ষণের জন্যে তোমরা গড়ের মাঠ হিসেবে কল্পনা করে নাও।

গড়ের মাঠ কেন বিখ্যাত সে কথা তোমাদের অজানা নয়! গড়ের মাঠ ভারতীয় ফুটবল জগতের প্রাণকেন্দ্র। তোমরা সকলে ফুটবল খেলাকে নিশ্চয়ই ভালবাস। শুধু কি তোমরা? ছোট বড়ো সকলেই।

আগ্রা যেমন তাজমহলের জন্য প্রসিদ্ধ ক'লকাতাও তেমনি এই ফুটবল খেলার জন্যে বিখ্যাত। এর জন্যে এখানে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, যে পরিমাণ দর্শকের সমাগম হয়, যে পরিমাণ উত্তেজনা, হৈ-হুল্লোড় ও রেষারেষি আর মন কষাকষির সূত্রপাত হয়—ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তার অর্দ্ধেকও হয় বলে আমার মনে হয় না। ফুটবল মরশুমে প্রতি বছর এখানে বিভিন্ন প্রদেশের সেরা সেরা খেলোয়াড়দের—মেলা বসে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দলগুলির আগমন হয়। পথে ঘাটে, মাঠে ময়দানে অলিতে গলিতে, অফিস-কাছারীতে,—সবত্রই ফুটবল আলোচনার বন্যা হইতে থাকে। প্রাণটা তখন খুশির আনন্দে নাচে না কি?

সুতরাং আমি তোমাদের কাছে ক'লকাতার সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লীগ নিয়ে কিছু আলোচনা করবো। তোমরা হয়তো জানো বর্তমানে এই লীগ প্রতিযোগিতায় মোট পনেরোটি দল রয়েছে। প্রতি দলকে মোট ২৮টি খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র সিনিয়র ডিভিশন ছাড়া অন্যান্য লীগ প্রতিযোগীতায় "রিটার্ণ ম্যাচ" অর্থাৎ ফিরতি খেলার ব্যাবস্থা নেই।

সিনিয়র ডিভিশন লীগ খেলায় এবছর একটা নতুন জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে যাকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা উচিত। মাত্র দুটি দল—এরিয়ান্স ও রাজস্থান ছাড়া, বাকি ১৩টি দল এ বছরে চিরাচরিত দুই ব্যাক প্রথাকে বর্জন করে নতুন পদ্ধতিতে অর্থাৎ তিন ব্যাক প্রথায় খেলা শুরু করেছে। স্থায়ীভাবে বাঙলাদেশে এই প্রথাকে প্রথম গ্রহণ করে—ইস্টার্ণ রেল দল। এদিক দিয়ে তাদের ধন্যবাদ না দিয়ে উপায় কি? ধন্যবাদ ইস্টার্ণ রেলদল।

লীগ খেলার প্রথম দিকে খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় দলগুলির অগ্রগমন অব্যাহত ছিলো। গাড়ির চাকার মত দলগুলির ভাগ্যচক্রও ঘুরপাক খেয়েছে বলতে হবে। শুরুতে মহামেডান দলের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বেশিদিন তারা তাদের প্রাধান্যের তরী ভাসিয়ে রাখতে পারল না। ক্রমে ক্রমে তারা ইষ্টবেঙ্গল দলের পিছনে চলে এলো। লীগের মাঝ দরিয়ায় বেশ কিছুদিন প্রভুত্ব চালাল ইষ্টবেঙ্গল দল। তারপর ছিঁড়লো পাল, ডুবলো তরী।—ইতিমধ্যে ইস্টার্ণ রেল দলের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে মোহনবাগানের তরী বহে চল্‌লো তরতর করে। এ সময় মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের আরও দৃঢ় হয়ে খেলতে দেখা গেলো। তারা একটির পর একটি করে প্রয়োজনীয় পয়েন্ট সংগ্রহ করতে দ্বিধা করলো না। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান দল তাদের পালতোলা তরীটির (মোহনবাগান দলের প্রতীক) গতিকে অব্যাহত রেখে সমস্ত দলগুলিকে পিছনে ফেলে লীগ বিজয়ীর সম্মান লাভ করলো। এবার নিয়ে মোহনবাগান দল ৯ বার এবং পর পর ২ বছর (১৯৫৯-৬০) লীগ বিজয়ী হ'ল। তোমরা শুনলে হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাবে যে একমাত্র মহামেডান দল ছাড়া কোন ভারতীয় কিংবা ইউরোপীয় দল এত অধিকবার লীগ জয়লাভ করতে পারে নি।

লীগের প্রথম তিনটি দলের ফলাফল দেওয়া হ'লো ঃ—

	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র	গোল দেঃ	গোল খাঃ	মোট
মোহনবাগান দল—	২৮	২২	১	৫	৬১	১০	৪৯
মহামেডান দল—	২৮	২২	২	৪	৫৫	১২	৪৮
ইষ্টবেঙ্গল দল—	২৮	১৭	৪	৭	৪১	১৩	৪১

লীগ বিজয়ী দলে যে সমস্ত খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেন তাদের নাম—**সনৎ শেঠ**; চিত্তরঞ্জন দাস; সুনীল গুহ; এ টি রহমান; প্রশান্ত সরখেল; জার্ণাল সিং; শৈলেন মান্না; অসীম ধর; কেম্পিয়া; নারসিয়া (সহঃ অধি); অমিয় ব্যানার্জি; দীপু দাস; সুকুমার সমাজপতি; সুনীল নন্দী; সালাউদ্দিন; অমল চক্রবর্তী; কেষ্ট পাল; চুণী গোস্বামী (অধিনায়ক); সুনীল ঘোষ; মানিক গোস্বামী ও কেষ্ট দত্ত (এস দত্ত)।

গোলদাতার নাম—

অমিয় ব্যানার্জি—১৪; সালাউদ্দিন—১৪, সুনীল ঘোষ—১০, দীপু দাস—৮, চুণী গোস্বামী—৬, নন্দী—৫, সমাজপতি—৩, অমল চক্রবর্তী—১।

তোমাদের পক্ষ থেকে লীগ বিজয়ী মোহনবাগান দলকে আমি বিশেষভাবে **অভিনন্দন** জানাচ্ছি।—সাবাস মোহনবাগান দল! সাবাস মোহনবাগান! সাবাস মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়বৃন্দ!

আজকে এখানেই শেষ করলাম। আগামী সংখ্যায়—"অলিম্পিকে **ভারতীয় ফুটবল দল**" ও "আই, এফ, শীল্ড" সম্পর্কে তোমাদের কিছু শোনাবার ইচ্ছে রইল।

একটি উড়োজাহাজ ধাপার মাঠ থেকে যাত্রা সুরু করে যখন ধ্যারধ্যারে গোবিন্দপুর পৌছুলো তখন সময় লাগলো এক ঘণ্টা দশ মিনিট। কিন্তু ধ্যারধ্যারে গোবিন্দপুর থেকে যখন ঐ উড়োজাহাজটি একই পথে সমগতিতে ধাপার মাঠে ফিরে এলো, তখন সময় লাগলো মাত্র ৭০ মিনিট!

বলতো, তা কি কখনও সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তবে কি করে??

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে। তবে উত্তর ৭৮ই ভাদ্রের মধ্যে দপ্তরে আসা চাই।

একটি শিকারীর কাহিনী

চিত্তরঞ্জন মাইতি

সারাদিন সোনার রথটি চালিয়ে সন্ধ্যায় সূর্যদেব এ্যাপোলো যখন চোখের আড়ালে চলে যান, তখন তার যমজ বোন ডায়েনা আসেন তাঁর রূপোর রথটি নিয়ে। ডায়েনা হলেন চাঁদের দেবী। সারারাত তিনি আকাশে চালান তাঁর রূপোর রথ। আবার ভোর হয়। পূব আকাশে দেখা যায় এ্যাপোলোর রথ। তখন ডায়েনা তার রথটি আকাশে রেখে মাটিতে নেমে আসেন।

চাঁদের দেবী ডায়েনার শিকারের বড় সখ। একদল বনদেবীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সবুজ বনের ভেতর শিকার করে বেড়ান। দিনের বেলা এমন গভীর বনে তিনি ঘুরে বেড়ান যে পৃথিবীর কোন লোকই তাঁকে দেখতে পায়না। শিকার করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ডায়েনা তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে সবুজ ঘাসের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করেন। পাশেই বইতে থাকে একটি ঝর্ণা। তার চলার ছন্দে বাজতে থাকে নুড়ির নূপুর।

সেই ঝর্ণার ঠাণ্ডা জলে তাঁরা স্নান করেন, আর তৃষ্ণা দূর করেন তার মিষ্টি জল পান করে।

এ্যাকটনকে হয়ত তোমরা চেন না। আজ আমি সেই এ্যাকটনের দুঃখের কাহিনীই তোমাদের শোনাব। আমাদের এই মাটির পৃথিবীর তরুণ শিকারী এ্যাকটন। খুব ভাল বাসত সে শিকার করতে।

সারাদিন একদল শিকারী কুকুর আর তীর ধনু নিয়ে সে বনে বনে ঘুরে বেড়াত।

একদিন এমনি শিকারের খোঁজ করতে করতে এ্যাকটন এসে পৌঁছল গভীর বনের ভেতর। সারাদিন ঘুরে ঘুরে সে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। পিপাসায় সে কাতর হয়ে পড়ল। এমন সময় পাশেই কোথাও ঝর্ণার ঝির ঝির ঝির শব্দ সে শুনতে পেল। এদিক ওদিক গাছের লতা পাতা সরাতেই তার চোখ গিয়ে পড়ল ঝর্ণাটির ওপর। কিন্তু সে

অবাক হয়ে দেখল কয়েকটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে সেই ঝর্ণার জলে স্নান করছে। এ্যাকটন মুগ্ধ হয়ে তাদের দেখতে লাগল।

বনদেবীদের নিয়ে ঝর্ণার জলে স্নান করতে এসেছিলেন ডায়েনা। ঝরণার পাশে ফুল বাগানে ফুল তুলতে তুলতে হঠাৎ ফিরে তাকাতেই এ্যাকটনের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি

হয়ে গেল। অমনি ডায়েনার মুখ রাগে রাঙা হয়ে উঠল। তিনি চীৎকার করে বললেন, ওরে পৃথিবীর মানুষ, মনে করেছিস স্বর্গের দেবী ডায়েনার কথা তুই ফিরে গিয়ে সবার কাছে বলবি। কিন্তু সে আর হতে দেবনা ;—এই বলে দেবী ডায়েনা ঝর্ণার জল হাতে তুলে ছিটিয়ে দিলেন এ্যাকটনের গায়ে।

এ্যাকটন ডায়েনার কথার উত্তর দিতে গিয়ে দেখল সে কথা বলতে পারছেনা। তারপর নিজের দিকে তাকিয়ে সে একেবারে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেল। যে হরিণকে সে রোজ শিকার করে বেড়ায় সে নিজেই ডায়েনার শাপে সেই হরিণ বনে গেছে।

নিজের নূতন দেহের কথা ভাবতে ভাবতেই সে শুনতে পেল তার নিজের কুকুরগুলোর ডাক। অমনি সে বনের গাছপালার ভেতর দিয়ে প্রাণভয়ে দৌড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু কতদূরই বা সে পালাতে পারবে। কুকুরগুলো অল্পক্ষণের ভেতরেই তাকে ধরে ফেলল। তারা চিনতে পারল না তাদের প্রভুকে। হতভাগ্য এ্যাকটনের দেহটাকে তার নিজেরই কুকুরগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। (গ্রীক কাহিনী)

নিজে জানো জানাও সবে

শ্রীসাংবাদিক

গত এক মাসে ভারতের বুকে যে সব ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কেন্দ্রীয় সরকার। কর্মচারীদেরর ধর্মঘট ও ভাষা আন্দোলনের ছদ্মবেশে আসামে অতুলনীয় বর্বরতা। এই দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরো বহু সংবাদ সৃষ্টি হয়েছে।

॥ ধর্মঘট ॥

ধর্মঘট আরম্ভ হল ১১ই জুলাই মধ্যরাত্রে। ২২ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী বেতন বৃদ্ধির ও আরো কিছু দাবীতে অসহযোগ আরম্ভ করলেন। রেলের চাকা ঘুরল না। টেলিগ্রামের টরেটক্কা বন্ধ হয়ে গেল। জল স্থল ও আকাশের পথে দেখা দিল ঘোর বিশৃঙ্খলা।

ধর্মঘটকে বেআইনী ঘোষণা করে সরকার ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতি অর্ডিনান্স জারী করেছিলেন ৮ই জুলাই পূর্বাহ্নে। তারপর ১৬ তারিখ রাত্রে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

॥ আসামে বাঙালী নির্যাতন ॥

এই ১৬ই জুলাই সারা পশ্চিমবঙ্গ ছিল শোকাচ্ছন্ন। ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়েছে আসামের বর্বরতার প্রতিবাদে। দাবী তুলেছে নিরপেক্ষ তদন্ত ও রাষ্ট্রপতি শাসনের। খুন জখম ঘরপোড়ানো, মা-বোনের প্রতি অত্যাচার ব্যাপকভাবে আসামে চলেছে বিশেষ করে বাঙালীদের উপর। ৩০শে জুন গৌহাটি শহরে সান্ধ্য আইন জারী হয় ১৪৪ ধারাও জারী করতে হয় শান্তি রক্ষার জন্যে। কিন্তু আইন শৃঙ্খলা দেখতে দেখতে সমগ্র আসাম উপত্যকায় ভেঙ্গে পড়ল। গোয়ালপাড়া, রঙ্গিয়া, নওগাঁ, কামরূপ, গৌহাটি প্রভৃতি বাঙালী প্রধান এলাকায় লুটপাট খুনজখম, নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে—নির্মম অত্যাচার চলতে লাগল। ১৫ই জুলাই জানা গেল ১০ হাজার

বাঙালী ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের কোন নিরাপত্তা নেই। এই সংখ্যা বর্তমানে ৫৫ হাজার পার হয়ে গেছে। যদিও গুণ্ডামী দমনের জন্য ৪টা জুলাই সৈন্যবাহিনী তলব করা হয়েছিল। ১৮ই জুলাই প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু উপদ্রুত এলাকায় পিটুনী কর বসাবার ধমকী দেন! তারও কোন ফল দেখা যায় না। ১৭ই জুলাই থেকে তিনদিন তিনি আসাম সফরও করেন।

পুনঃর্বাসনের জন্য বাঙালী উদ্বাস্তুরা আসামে ফিরে যেতে আজ সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। আতঙ্কে তারা ভেঙ্গে পড়েছে। সমস্ত বিশ্বাস হারিয়েছে।

॥ নাগাভূমি ॥

৩০শে জুলাই ভারত সরকার পৃথক নাগারাজ্য গঠনের দাবী মেনে নিয়েছেন। নাগারাজ্যের দাবী মেনে নেবার পরই ৫ই আগষ্ট পূর্ব ভারত উপজাতি ইউনিয়ন স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্মারকলিপি প্রস্তুত করতে লেগে পড়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিলং পৌঁছলেই এই স্মারকলিপি দাখিল করা হবে। তাহলে, এখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মোট রাজ্য সংখ্যা হল ষোল।

॥ শিক্ষা ঃ বিশ্ববিদ্যালয় ॥

১৩ই জুলাই পঃ বঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্কুল ফাইন্যালের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়—১০,০৮৯ জন। হিউম্যানিটিজ শাখায় প্রথম বিভাগে এসেছেন প্রায় ৪০ জন। বিজ্ঞান শাখায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা বেশী। এবার ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা পাশ করেছে বেশী কিন্তু প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান নেই তাদের।

স্কুল ফাইন্যালে বসে ১,০২,৪৭৬ জন। ১৯৫৮ সালের সিলেবাসে যারা পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের মধ্যে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে মাত্র ৯ জন।

আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষার ফলাফল শতকরা ৩৬ ও ৪৫ জন।

স্কুল ফাইনাল ও উচ্চ মাধ্যমিকের কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার তারিখ ঠিক হয়েছে ৮ই সেপ্টেম্বর।

॥ বিদেশের খবর ॥

পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল গত ২১শে জুলাই। সিংহলের নিহত প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়কের স্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক (৪৪) লঙ্কা ফ্রিডম পার্টির পক্ষে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। ইনিই হবেন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

২৭শে জুলাই আরব প্রজাতন্ত্র ইরাণের রাষ্ট্রদূতকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেন। কারণ? ইরাণ ইজরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নেয়। তাইতেই আরব প্রজাতন্ত্র বিক্ষুব্ধ।

২৭শে জুলাই বৃটিশ মন্ত্রী সভার রদবদল ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগের ফলে দশটি পদের রদবদল হয়।

২৭শে জুলাই ইতালীর নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। বামপন্থী উপদলের নেতা অধ্যাপক ফানাফনি হয়েছেন প্রধান মন্ত্রী। ১৭ বছর আগে ফ্যাসিবাদের পতনের পর এ হোল ইতালীর ২২তম মন্ত্রীসভা।

২৭শে জুলাই রিচার্ড নিক্সনকে আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেন। আগামী ৮ই নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার আপার ভল্টা ৫ই আগস্ট সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে নিজেকে ঘোষণা করেছে।

সহরের সিনেমা, না সিনেমার সহর?

অনেক সহর গ্রাম ঘুরে তোমরায়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো, একটি গ্রামে বা সহরে অনেক সময় দশ হাজার লোকই খুঁজে পাওয়া ভার।
কিন্তু নিউইয়র্কে একটি "সিনেমা হল" আছেযেখানে একসঙ্গে বসে কমছে কম দশহাজার লোক, সিনেমা দেখতে পারে। হলের নাম "রক্সী"। ভাবতো, কী বিরাট ব্যাপার!

[এই বিভাগে নিয়মিত ভাবে শিশু ও কিশোর প্রতিষ্টান সমূহের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশ করা হয়। সম্পাদকের নামে আমন্ত্রন পত্র পাঠালেই রোশনাই'-এর প্রতিনিধি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাঠান হবে।]

॥ এস্‌প্লানেডের কুমীর ॥ একটি অভিনব অভিনয় ॥

গত ৭ই আগস্ট মনিমেলা মহাকেন্দ্রের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে একটি মনের মত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের অংশ গ্রহণ করে ক্ষুদে অভিনেতার দল। শ্রীশৈলেন ঘোষ রচিত "এস্‌প্লানেরেড কুমীর" নামক অভিনব নাটকটি খুব সাফল্যের সঙ্গে ঐ অভিনেতারদল অভিনয় করে। ছোটদের অভিনয় দেখে যে বড়োরাও আনন্দ হাসিতে ফেটে পড়েন তার প্রমাণ পাওয়া গেলো সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে।

॥ বিচিত্র অনুষ্ঠান ॥ প্রতিষ্ঠা উৎসব ॥

সব পেয়েছির আসরের প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে গত ৭ই আগস্ট সকালে মহাজাতি সদনে একটি মন মাতানো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নব মিতালী আসর ও গোপী মোহন আসরের ছোট ছোট বোনেরা মাংগলিকী, শংখধ্বনি ও বৈদিক স্তোত্র সহকারে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে। তারপর আসরের পরিচালক স্বপনবুড়ো আসরের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বুঝিয়ে ছোটদের কাছে প্রাঞ্জল ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত

ভাষণ দেন। বিভিন্ন আসরের পক্ষ থেকে বিচিত্র কর্মসূচীর মাধ্যমে ছোটরা যে প্রতিভার পরিচয় দেয় তা' সকলকেই তৃপ্ত করে।

॥ কবি ৺সুনির্মল জয়ন্তী ॥ একটি মনোরম অনুষ্ঠান ॥

গত ৮ই শ্রাবণ প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ৺ সুনির্মল বসুর জন্ম জয়ন্তী পালন করেন বঙ্গীয় শিশু সাহিত্য সম্মেলন। কবি নরেন্দ্র দেবের বাসভবনে অনুষ্ঠিত ঐ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য। বাংলা দেশের তরুণ সাহিত্যিকবৃন্দ স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করেন। কুমারী শিউলি দে কবি সুনির্মলের কতগুলো কবিতার সুর সংযোজন করে তা' পরিবেশন করলো সভায় একটি নূতন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বহু শিশু কিশোর সুনির্মলের কবিতা আবৃত্তি করে অনুষ্ঠানটিকে সুন্দর করে তোলে।

শ্রীমতী রাধারানী দেবী, ধীরেন বল, সুকোমল বসু, বিজন গঙ্গোপাধ্যায় ও বঙ্গীয় শিশু সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীরমেন দাস কবি জীবনের কতগুলো ঘটনা ছোটদের কাছে তুলে ধরেন।

॥ রোশনাই কার্যালয় ॥
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-বারো ।

প্রিয় বন্ধুরা,

শরৎ ভোরের নীল নীল আকাশে মেঘ পরীদল সাথীহারার গোপন ব্যথা বুকে নিয়ে যখন এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাল্‌কা হাওয়ার হিমেল পরশে ওরা যখন পথভ্রান্ত, আমি কিন্তু খুঁজে পেলাম তখন হাজারো বন্ধুর হাসি খুশী ভরা মুখ। সোনালী শরতের মুঠো মুঠো নরম আলোর হাসি যেন ফুটে উঠেছে তৃপ্তিভরা তোমাদের সকলের চোখে মুখেও। তা ফুটে উঠবে না? একটানা বর্ষণ ক্লান্ত দিনের শেষে খুশীর নেশায় শরতের সূর্যও যে কেমন সুন্দর হাসি হেসে উঠেছে! তাইতো হাসছে প্রকৃতি হাসছে নীল ঘন আকাশ আর তারি সুরে সুর মিলিয়ে নাচছে শরতের হিমেল বাতাস!

গত বছর এমনি এক শরতের ভোরেই আগমনীর সুরে সুরে সুর মিলিয়ে হেসে উঠেছিলো রোশনাই, তোমাদের সামনে। তার রূপ ছিলো তখন বার্ষিকী। আর এবারে এই শরতের প্রথম ভোরে রোশনাই রূপান্তরিত হলো মাসিকে। মাসে মাসে তোমাদের হাজারো মনের রকমারী খোরাক নিয়ে রোশনাই ধরা দেবে তোমাদের কাছে। নিত্য নূতন রচনা কুসুমে আর বিচিত্র রসে পুষ্ট হয়ে। তাই, আশাকরি, রোশনাই-এর এই নব জন্মের আনন্দে সবাইতো হাসবেই; দেশের শিশু-কিশোর দরদি বড়োরাও তৃপ্তির হাসি হাসবেন নূতন আশার সম্ভাবনায়!

আগামী বারে আমরা আবার এই মজলিসে মিলবো। সেই আশাতেই তোমাদের চেনা অচেনা সকলকে আমার হৃদয়-গভীর শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

ইতি

১লা ভাদ্র ॥ ১৩৬৭

প্রাতিরত

তোমাদের সম্পাদক বন্ধু

ঃ শিশু সাহিত্য সংঘের বই ঃ

পড়তে পড়তে যারা খেলার জন্য ছুটে যায়, খেলতে খেলতেও তারা যাতে পড়ার জন্যে ছুটে আসে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই প্রথম পাঠের বইকেও মন ভোলানো খেলার সামগ্রী করে তুলেছেন—

ব্রজ রায়চৌধুরী

ছবিতে ১ ২ ৩ ৪ (হিন্দী ও বাংলা) ১·২৫
(ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত)

ছবিতে অ আ ক খ ১·০০

ছবিতে বুদ্ধদেব (হিন্দী ও বাংলা) ১·৫০

ছবিতে জানোয়ার ১·২৫

—চরিতকথা সিরিজ—

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
আচার্য জগদীশচন্দ্র
দানবীর হরেন্দ্রকুমার
লোকমান্য তিলক
বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা

(প্রত্যেকখানা ৭৫ নয়া পয়সা)

যারা শৈশবোত্তীর্ণ কিশোর তাদের জন্য

নিখিল সেন

আমাদের নেহরু ২·৫০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

ছোটদের গোর্কীর মা ২·০০

শেক্‌সপীয়ারের নাটকের গল্প ২·০০

যাঁরা কৈশোরোত্তীর্ণ, যাঁরা বিদগ্ধ, তাঁদের জন্য সুখপাঠ্য ভ্রমণ কাহিনী

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও রামেন্দ্র দেশমুখ

রূপময় ভারত ॥ ৪·০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ শরৎ বুক হাউস

১৮ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-১২

৩৪—৩৭৩৩

ঃ এগুলিও পড়তে পার ঃ

কবি তরু দত্ত

২·৫০

রাজকুমারমুখোপাধ্যায়

তরু দত্তকে কবি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বর্তমান লেখক। যদিও গ্রন্থের নাম "কবি তরু দত্ত।" তবু তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের চতুর্দিক নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন। রাজকুমার বাবু ঐতিহাসিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থে। ...রচনা গুণের জন্যও তাঁর এই গ্রন্থ অবিস্মরণীয়। —আনন্দবাজার

আজকের পশ্চিম

৪·৫০

ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ

এই মূল্যবান ও শিক্ষাপ্রদ বইটি সকলেরই সযত্নে পড়া দরকার।

॥ যুগান্তর ॥

শরৎচন্দ্র—দেশ ও সমাজ ২·০০

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ ৩·৫০

নীলরতন সেন

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—বারো

৩৪—২৩৮৬

ফ্রক গেঞ্জী জামা কাপড়,
কার কি বলো চাই ?
যা কিছু চাও মিলবে সবই
অভাব কিছুর নাই !

জয়দেব স্টোর্স
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা—১২

—৪৫ বৎসরের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান—

বসন্ত কেবিন

(আদি)

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

ফোন ৩৪-১২০৩

।। পল্লীর প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান ।।

৺অতুল চন্দ্র নন্দী

শ্রীতীর্থপদ নন্দী

৬০।৬১ বি, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা—১২

টেলিফোন ঃ ৩৪-১০৪৪

সকল রকম চাউল, ডাইল, আটা, ময়দা,

তৈল, ঘৃত প্রভৃতি

পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

ছোটদের মনের মত বই

শ্রীমোহিত রায় প্রণীত

কোরক

জয়যাত্রী

* মহাজীবনের কাহিনী
* দ্বিজেন্দ্রলাল

একের ভিতর অনেক

* জেনে রাখো
* সন্ধানী
* কবিতা মালা
* কবিতা বিতান

ঃ পরিবেশক ঃ

—বাণী-তীর্থ—

২৬।২, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

অশোক লিথোগ্রাফিং কোং

—সৌজন্যে—

১২৮, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

এখানে পাবেন চপ, কাটলেট, কারি, পরটা, চা, সিঙাড়া ইত্যাদি

সততায় নূতনত্বে বৈচিত্রে সস্তায় পরিচ্ছন্নতায়

সুপ্রিয় রেষ্টুরেন্ট

ফোন—৩৪-১২০৩ বি-৪৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ।। কলিকাতা-১২

মৃণাল দত্ত কর্তৃক দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা—হইতে মুদ্রিত ও "রোশনাই" কার্যালয়—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে প্রকাশিত।